

ইতিহাসের

বৈশিষ্ট্য

পিনাকী
ভট্টাচার্য

ইতিহাসের ধুলোকালি

পিনাকী ভট্টাচার্য



গার্ডিয়ান

পা ব লি কেশ ন

সূচিপত্র

মাদ্রাসা প্রসঙ্গ

মাদ্রাসা ছাত্ররা বাংলাদেশকে আফগানিস্তান বানাবে
 মাদ্রাসায় কেন জাতীয় সঙ্গীত গাইতে হবে
 মাদ্রাসায় হিন্দু ছাত্র পড়তে পারে কি
 সিলেবাসকে হেফাজতিকরণ করা হয়েছে কি
 ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদ্রাসা ছাত্রদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ
 কমিউনিটি এডুকেশন কেন প্রাথমিক শিক্ষার সবচেয়ে ভালো মডেল

মুক্তিযুদ্ধ ভারত ও পাকিস্তান

পাকিস্তান কি ৭১ এর কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়েছিল
 ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কী খায়েশ নিয়ে সাহায্য করেছিল
 মুক্তিযুদ্ধের সময় কি শুধু ভারতই শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছিল

মৌলবাদ

মৌলবাদ শব্দটা কীভাবে এলো
 মৌলবাদী কে? মৌলবাদের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক থাকা কি আবশ্যিক
 ‘মৌলবাদ’ বলতে কী বোঝায়

কমিউনিস্ট দলগুলোর সমস্যা

ভারতীয় কমিউনিস্টদের বর্ণবাদীতা
 সিপিবি ও কোরান সুন্যাহর খেলাফ হয় এমন কোন অর্জন চায়নি ১৯৫৩ তে
 সিপিবি কি একটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল
 স্বাধীন বাংলাদেশের বিরোধীতায় সিপিবি
 বাংলাদেশের বামপন্থীদের স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান
 হিন্দু মহাসভার বয়ান কেন মনি সিংহের মুখে
 কার্ল মার্ক্স কি রাষ্ট্রীয় খরচে প্রাথমিক শিক্ষার পক্ষে ছিলেন

হিন্দু ও মুসলমান প্রসঙ্গ

বাংলাদেশে ‘সাম্প্রদায়িক’ শব্দটা কেন গালি হিসেবে ব্যবহৃত হয়
 বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা কমছে কেন
 হিন্দুরা কি বাংলাদেশে নিপীড়িত
 এই ভূখণ্ডে প্রথম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কোথায় হয়
 ভারতে মুসলমান নিপীড়ন বনাম বাংলাদেশে হিন্দু নিপীড়ন
 কেন আমি নিয়ম করে সকাল-বিকাল মুসলমানদের যথোচিত গালিগালাজ করি না
 স্বামী বিবেকানন্দের মুসলমান সমাজ সম্পর্কে মূল্যায়ন
 হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সংবলিত আসনের দাবী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার পায়তারা
 হিন্দু মুসলিম সমস্যা নিয়ে কী হিন্দু মুসলিম নেতরাই কথা বলতে পারবে
 বিচার মানি তালগাছ আমার

ভারত ও বাংলা ভাগের দায়

মুসলমানরা এবং মুসলিম লীগ দ্বি-জাতি তত্ত্বের জন্ম দেয়নি; দ্বি-জাতি তত্ত্বের জন্ম হিন্দুদের হাতে
 ভারত ভাগের দায় কি মুসলমানদের আর জিন্মাহর
 ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন কি আক্রমণকারী হিসেবে
 বাংলা ভাগে দায় কার
 ভারত ভাগের দায় কি মুসলিম লীগের

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের অবদান

বৃটিশ শাসনের অবসানে ও মুসলমান সমাজের লড়াই
 ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের অবদান

ভারতবর্ষ ও মুসলমান সম্পর্কে প্রচারিত ভুল ধারণা

ভারতবর্ষে মুসলমানেরা আসার অনেক আগেই পর্দা বা অবরোধ প্রথা ছিল
 ভারতে কি মুসলমান শাসকেরা হাজার হাজার মন্দির ভেঙেছে
 এ পি জে আবদুল কালাম কেন ইফতার পার্টি দিতেন না
 শহীদ তিতুমীর কি রেইসিস্ট

ভারত সম্পর্কে ভুল ধারণা

শত্রু সম্পত্তি আইনের মতো আইন ভারতে হয়েছে অনেক আগে
 ভারতের সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষতা
 ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ

হিন্দু রাজাদের হাতে ভারতের মন্দির ধ্বংসের অজানা ইতিহাস
 ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতীক অশোক স্তম্ভে কি লেখা আছে
 ‘জাতিস্মর’ সিনেমা বাঙালি হিন্দুদের মোক্ষলাভ

বখতিয়ার ও নালন্দা

বখতিয়ার খলজি এবং নালন্দা ধ্বংস- ১
 বখতিয়ার খলজি এবং নালন্দা ধ্বংস- ২
 নালন্দা কি বখতিয়ারের আক্রমণেই ধ্বংস হয়েছিল
 বখতিয়ারের নালন্দা ধ্বংসের মিথ

রাশিয়া ও ইসলাম

সোভিয়েত ইউনিয়নে ইসলাম
 রাশিয়ার বিপ্লব ও মুসলমান মননে তার প্রভাব

ইসলাম ও বিজ্ঞান

‘ইসলামিক বিজ্ঞান’ প্রসঙ্গ- ১
 ‘ইসলামিক বিজ্ঞান’ প্রসঙ্গ- ২
 ‘ইসলামিক বিজ্ঞান’ প্রসঙ্গ- ৩
 ‘ইসলামিক বিজ্ঞান’ ছাড়া আজকের বিজ্ঞান অকল্পনীয় ছিল
 মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান
 বিজ্ঞান কি একটা ধর্ম? ব্রাত্য রাইসুর প্রশ্নের জবাব

ভারত ও বাংলাদেশ ইস্যু

এই ভূখণ্ডে হিন্দু-মুসলমানদের লজ্জার ইতিহাস ও আমাদের করণীয়
 ভারতের পানি সন্ত্রাস
 দুইয়ে দুইয়ে চার
 গর্দভ নেতা সব রাষ্ট্রের জন্যই বিপদজনক
 সোহরাওয়ার্দী প্রবলভাবে অসাম্প্রদায়িক ছিলেন

মুক্তিযুদ্ধ

জাফর ইকবাল: উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে দিলে কি চলবে
 বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র থেকে জিয়াউর রহমানের একটি মূল্যায়ন

রাজনীতি: জাতীয়

থেমিসের মূর্তি ভাঙা কোনো প্রতিক্রিয়াশীল কাজ নয়

আমেরিকা, পশ্চিম ও মুসলমান সম্প্রদায়

আমেরিকা দাস ব্যবস্থা ও মুসলমান সম্প্রদায়
সন্ত্রাসী হামলা ও মুসলমানদের গিল্ট কনসার্স
প্যারিসে সন্ত্রাসী হামলা
পশ্চিম ইসলামকে বুঝতে পারেনি

ধর্ম ও সভ্যতা

ধর্ম অবমাননা মানবাধিকার লঙ্ঘন
তরুণ সম্প্রদায় কেন ধর্মের দিকে ঝুকে পড়েছে
পশ্চিমা সভ্যতার ভিত্তি তৈরী করেছে খ্রিস্টধর্ম
ধর্ম অবমাননা একটি অপরাধ
ধর্ম কি মানুষে-মানুষে বিবেধ তৈরি করে
প্রত্যেক ধর্মকে তার নিজের আলোকেই মূল্যায়ন করতে হবে
আত্মা কি আছে
নাস্তিকতা বা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতার চর্চা, কখনো তার অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না

বাংলা ও মুসলমান

বাংলা সাহিত্যে মুসলমানেরা
বাংলায় ইসলামের প্রসারের কারণ
বঙ্গে ইসলামি বিজয় কেন ভায়োলেন্ট হয়নি
বাংলা ভাষার উৎপত্তি কি সংস্কৃত ভাষা থেকে
বাংলা ভাষা ও মুসলমানদের অবদান
পর্দা প্রথা ও নারী

ইসলামের প্রথা রাজনীতি ও মুসলমান সম্প্রদায় নিয়ে ভুল ধারণা

জিজিয়া কর কি ভিন্ন ধর্মের ওপর অবিচার ও নিপীড়নমূলক কর ছিল
জামাত, হেফাজতের লক্ষ্য কি এক
বেহেশতের টিকিট কেনাবেচা
মুসলিম সম্প্রদায়ের কোনো বৈশ্বিক একক রাজনীতিক কেন্দ্র না থাকা

ইমরান খান প্রসঙ্গে তসলিমা নাসরিনের বক্তব্যের জবাবে
ইমরান খান কি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছেন

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ কি নাইট উপাধি পরিত্যাগ করতে পেরেছিলেন
রবীন্দ্রনাথ ও কি চাপাতির ভয় পেয়েছিলেন
ব্যাংক লুটের একাল-সেকাল

বিবিধ ভুল ধারণা

রাষ্ট্রধর্ম কি রাষ্ট্রের ধর্ম
মানবতাবাদ: একটা জনপ্রিয় কিন্তু ভুল বুঝা ধারণা
“মুক্তমনা” ব্লগটি কাঁদের এবং তাঁরা আসলে কী চায়
আমাদের ভূখণ্ডে ন্যায়ের ধারণা
ওড়না নিয়ে সেকুলার আপত্তি
ভাষা কখন রাজনীতি হয়ে ওঠে
যেখানে বিজ্ঞান শেষ, প্রজ্ঞার শুরু সেখানেই
রাষ্ট্রীয় নির্ধাতনে রয়েছে ডেমোক্রেসির দার্শনিক উপাদান
জাতীয়তাবাদ কি একটি আদর্শ
ভারতবর্ষ এবং এশিয়ায় চুম্বন ভালোবাসার প্রতীক ছিল ন

হিন্দু ও মুসলমান প্রসঙ্গ

বাংলাদেশে ‘সাম্প্রদায়িক’ শব্দটা কেন গালি হিসেবে ব্যবহৃত হয়?

এটা খুব কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন। সম্প্রদায়ের সাথে থাকা, মিশে থাকা, সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা অনুভূতি থাকা কোনো নেতিবাচক কিছু না। ফলে অরিজিনালি নিজ সম্প্রদায়ের সাথে থাকা অর্থে সেখান থেকে ‘সাম্প্রদায়িক’ একটা ইতিবাচক শব্দ। ঠিক যেমন ইংরাজিতে কমিউন বা কমিউনিটি শব্দটা খুবই ইতিবাচক শব্দ। কোনো ডেরোগেশন বা ডেরোগেটরি শব্দও অর্থ নয় এটা।

বাঙলা ভাষাভাষীদের কাছে ‘সাম্প্রদায়িক’ শব্দটাকে গালি হিসেবে ব্যবহার চালু করে তোলার কৃতিত্ব হিন্দুদের। এটা মুসলমানদেরকে গালি দেয়ার জন্য হিন্দুদের একটা আবিষ্কৃত শব্দ। এমনভাবে শব্দটা ব্যবহার করা হয় যেন এটা শুনতে শোনায় এমন—‘তুই ব্যাটা মুসলমান’।

তাই এককালে এই শব্দটা কিন্তু পজিটিভ অর্থেই ব্যবহার করতো হিন্দুরাও। ১৮২৭ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত দর্পন পত্রিকায় একজন সম্পর্কে ভালো কথা বলার জন্য লেখা হচ্ছে—

‘সাম্প্রদায়িক মর্য্যদক পরোপকারক সহনশীল মনুষ্য ছিলেন।’

এখানে সাম্প্রদায়িক শব্দটার অর্থ ‘আপন সম্প্রদায়ের’। সম্প্রদায়ের মানুষ বুঝাতে রবীন্দ্রনাথও ব্যবহার করেছেন এই শব্দটা। তিনি লিখেছেন—

‘যুরোপে সৌন্দর্যচর্চা সৌন্দর্যপূজা বলিয়া একটা সাম্প্রদায়িক ধোঁয়া আছে।’

এটা তিনি লিখছেন ১৯০৭ সালে। কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ অর্থে বিদ্বিষ্ট হিসেবে এই শব্দটার রবীন্দ্রনাথ আবার ব্যবহার করেছেন আরো পরে ১৯৩১ সালে। যেমন তিনি লেখেন—

‘পিয়র্সন কয়েক জোড়া সবুজ রঙের বিদেশি পাখি আশ্রমে ছেড়ে দিয়েছিলেন। অনেক দিন তারা এখানে বাসা বেঁধে ছিল। আজকাল আর দেখতে পাই নে। আশা করি কোনো নালিশ নিয়ে তারা চলে যায় নি, কিংবা এখানকার অন্য আশ্রিত পশু-পাখির সঙ্গে বর্ণভেদ বা সুরের পার্থক্য নিয়ে তাদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটেনি।’

সেই কারণেই, প্রায় ১০০ বছর আগে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাঙলা অভিধানে ‘সাম্প্রদায়িক’ বলে কোনো শব্দ নেই। ১৯৩৪ সালে হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষে সাম্প্রদায়িক শব্দের অর্থ বলা হয়েছে—

১. সম্প্রদায় হইতে আগত ।

২. সম্প্রদায় বিশেষের মতাবলম্বী ।

কিন্তু অধুনা সংসদ বাঙলা অভিধানে এই সাম্প্রদায়িকতা শব্দের এইবার একটা তিন নম্বর অর্থ যুক্ত হতে দেখি, তা হচ্ছে—‘সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন’।

তাহলে আমরা খুব স্পষ্ট দেখতে পেলাম, এই শব্দটাকে একটা গালি হিসেবে ব্যবহারের জন্য এখানে খুব কৌশলে নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু গালিটা কাকে?

এবার দেখুন এটার প্রথম দিককার পলিটিক্যাল ব্যবহার।

১৯৩৭ সালে শেরেবাংলা অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী হয়ে বেঙ্গল প্রজাস্বত্ব আইনের একটা সংশোধনী বিল আনেন। সেই বিলে তিনটা সংশোধনী ছিল বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের। বলে রাখা ভালো, এই বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন দিয়েই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে আমাদের পূর্বপুরুষদের জমি কেড়ে নিয়ে জমিদারি প্রথার আইনি ভিত্তি সৃষ্টি করা হয়।

শেরেবাংলার সংশোধনীগুলো ছিল:

১. রায়ত যদি জমি হস্তান্তর করতে চায়, জমিদারের বাগড়া দেয়া ছাড়াই জমি স্বাধীনভাবে হস্তান্তর ও ভাগ করতে পারবে।
২. জমিদারদের খাজনা বৃদ্ধির অধিকার রদ করা হয়।
৩. সেলামি ও নজরানা ফি নামের জমিদারকে দেয় জমি হস্তান্তর ফি বাতিল করা হয়।

খেয়াল করলে দেখবেন জমিদারের কর্তৃত্বকে ব্যাপকভাবে খর্ব করা হয়েছিল এই বিলে। হিন্দু জমিদাররা এই প্রথম এই বিলকে ‘সাম্প্রদায়িক’ বলে প্রত্যাখ্যান করে। এখানে সাম্প্রদায়িকতার কী আছে? এটা তো একটা প্রগতিশীল পদক্ষেপ। জমিদারের পেটে লাথি মেরেছে ঠিকই, কিন্তু এটা ‘সাম্প্রদায়িক’ হয় কীভাবে?¹

এরপরে ১৯৪৮-এর ৭ এপ্রিল পূর্ব বাঙলা বিধান পরিষদে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদের জন্য ‘পূর্ববাঙলা জমিদারি ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব বিল’ উত্থাপন করা হয়। বিধানসভার নেহেরু কংগ্রেসের সদস্যরা বিলটির বিরোধিতা করেন। একজন বিধায়ক বলেন—

¹. বাঙলা ভাগ হল; জয়া চ্যাটার্জি, ইউপিএল, ২০১৪, পৃষ্ঠা: ১২৫

‘স্যার, আমি এ ব্যাপারে আরো বলতে চাই যে, দুর্ভাগ্যবশতঃ অধিকাংশ বড় জমিদাররা হিন্দু হবার ফলে তা প্রস্তাবিত বিলটিকে একটা সাম্প্রদায়িক চরিত্র দান করবে।’^২

এই কংগ্রেসি আলোকে এইবার সাম্প্রদায়িকতা আর অসাম্প্রদায়িকতা শব্দ দুইটার মর্মার্থ খুঁজুন। এর মর্মার্থ হচ্ছে, আমার সেই জমিদারির রুস্তমি ফিরিয়ে দাও।

সেকুলার বয়ানে তাই সাম্প্রদায়িকতা মানে জমিদারি কেড়ে নেয়া; আর অসাম্প্রদায়িকতা মানে হচ্ছে জমিদারি ফেরত দেয়া। অবশ্য তারা জমিদারি মানে ম্যাটারিয়াল ফর্মে জমিদারি বুঝায় না। যা বুঝায়, তা হচ্ছে সেই জমিদারী শান শওকত, সামাজিক প্রতিপত্তি, রাজনৈতিক প্রভাব, কালচারাল রুস্তমি এগুলো সবই।

তার মানে, হিন্দুদের তৈরি বয়ানে, চিন্তার কাঠামো এবং কঙ্গট্রাকশনের যেই বিরোধিতা করবে, হিন্দুদের সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অথরিটি করে সাজানো বাগানের অর্ডার বা শৃঙ্খলায় যে আঘাত করবে, ভিন্নভাবে সাজাতে চাইবে, নিজের ভাগ অধিকার চাইবে—সেকুলার এবং হিন্দুকুল তাঁকে ‘সাম্প্রদায়িক’ আখ্যা দেবে।

বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা কমছে কেন?

বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতে একটা প্রচারণা আছে যে, বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা কমছে; কারণ তাঁরা বাংলাদেশে মুসলমানের নির্যাতনের কারণে থাকতে পারে না, তাই তাঁরা দেশত্যাগ করে। এই বয়ানের পক্ষে তাঁরা সবসময় সোচ্চার থাকে। অস্বীকার করছি না যে, বাংলাদেশে হিন্দুরা নির্যাতিত হয়। কিন্তু নির্যাতনের কারণে দেশত্যাগ করায় হিন্দুদের সংখ্যা কমছে, এটা কোনোভাবেই তথ্য সমর্থন করে না।

বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা কমার দুটো প্রধান কারণ—

১. ভারতের হিন্দুত্ববাদ ভারত রাষ্ট্রকে হিন্দুদের পিতৃভূমি এবং পবিত্রভূমি বলে দাবি করে। তাই এই রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রে বসবাসরত সংখ্যালঘু হিন্দুদের মনে একটা বিকল্প নাগরিকত্বের সম্ভাবনা জাগরুক রাখে। তাঁরা ভারত রাষ্ট্রকে অবচেতনে নিজের পলিটিক্যাল এজেন্ট হিসেবে ভাবতে থাকে। ভারত রাষ্ট্র হিন্দুত্ববাদ দিয়ে তাঁদের এক তীব্র ধর্মীয় জজবায় আকর্ষণ করতে থাকে। একইভাবে শ্রীলঙ্কান তামিলদের ভারতে মাইগ্রেশনের একটা ট্রেন্ড আছে। নেপাল থেকে হিন্দুদের তো ভারতে মাইগ্রেশন হয় না। কারণ তারাই তাঁদের রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ।

২. পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি; বদরুদ্দীন উমর, পৃষ্ঠা: ১৩১-১৩২

২. হিন্দু জনগোষ্ঠীর প্রজনন হার কম। ১৯০১ সাল থেকে হিন্দুদের প্রজনন হার মূলত ২-৫ শতাংশ। ১৯৪১ সালেই তা একবার ১০%-এর উপরে উঠেছিল। মুসলমানদের প্রজনন হার ১৯৪৭-এর পর থেকেই ২০%-এর উপরে। অবাক করার বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশে খ্রিস্টান এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সংখ্যা বাড়ছে। এমনকী শেষ সেনসাসে বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী মুসলমানদের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। ধর্মীয় নির্যাতনই যদি জনসংখ্যা কমার একমাত্র কারণ হতো তাহলে বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান জনসংখ্যা বাড়ার কোনো কারণ ছিল না।

তাহলে বাংলাদেশে ধর্মীয় নির্যাতন নিয়ে কি আমাদের কিছুই বলার নাই? নিশ্চয় আছে।

এই সমস্যা আসলে কোনো ধর্মীয় সমস্যা নয়। এই সমস্যা আসলে রাষ্ট্র গঠনের সমস্যা। একটা সফল রাষ্ট্র বানাতে পারলে এই সমস্যা থাকতো না। এপার এবং ওপারের সেক্যুলাররা মনে করে, বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক প্রমাণ করতে না পারলে বুঝি বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে হিন্দু বা হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার-নির্যাতনের আর কোনো ব্যাখ্যা দেয়া যাবে না। হিন্দু যে কারণেই নির্যাতিত হোক, তাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের হাতে সংখ্যালঘু হিন্দুর অত্যাচার-নির্যাতন হিসেবে ব্যাখ্যা যেন করতেই হবে। হিন্দু নির্যাতন মাত্রই সাম্প্রদায়িকতা প্রমাণ করবার অভ্যাস থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। হিন্দু যে কারণেই নির্যাতিত হোক, তাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের হাতে সংখ্যালঘু হিন্দুর অত্যাচার-নির্যাতন হিসেবে ব্যাখ্যা করা যাবে না। এটাই ওয়ার অন টেরর প্রোজেক্টের বয়ান। যার লক্ষ্য হচ্ছে মুসলমানদের বর্বর, পরধর্মে অসহিষ্ণু, ভিন্নচিন্তার প্রতি খড়গহস্ত হিসেবে দেখানো।

বাংলাদেশের হিন্দুদের নিজেদের বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে হিস্যা দাবি করতে হবে। অথচ অবাক বিষয়, বাংলাদেশের হিন্দুরা নাগরিক হিসেবে নয়, বরং হিন্দু হয়ে আলাদা সুরক্ষার দাবি তুলছে। হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলাদেশে হিন্দুদের জন্য আলাদা আসন দাবি করেছে। বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট আরো স্পষ্টভাবে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা, পৃথক মন্ত্রণালয় ও সংসদে ৬০টি সংরক্ষিত আসনের দাবি জানিয়েছে।

এটা ভুলে গেলে চলবে না, বাংলাদেশে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের শাসন চলছে, সেই শাসকদের অংশ হিসেবে হিন্দুরাও জাতীয় সংখ্যাগুরু। বাঙালি জাতির অংশ হিসেবে তার সম্প্রদায়গত অবস্থান নির্যাতিতের নয়।

বাংলাদেশে যে ফ্যাসিস্ট শাসন জনগণের ওপরে চেপে বসেছে, তার ভিত্তিকে প্রশ্ন করতে না শিখলে আমরা কখনোই বাংলাদেশকে একটা অগ্রসর রিপাবলিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারবো না। হিন্দু নির্যাতনের ফয়সালা তো দূরের কথা।

হিন্দুরা কি বাংলাদেশে নিপীড়িত?

‘হিন্দুরা বাংলাদেশে নিপীড়িত’ এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান বয়ান। এই ইন্ডিয়ান পজিশনকে ইন্টেলেকচুয়ালি সাপোর্ট করে বাংলাদেশের বাম, সেক্যুলার ও চেতনাজীবীরা। ইন্ডিয়া বাংলাদেশকে একটা আধুনিক রিপাবলিক হিসেবে না দেখিয়ে নানা ধর্মে বিভক্ত রাষ্ট্র হিসেবে চিত্তা করে। সেই রাষ্ট্রে নাগরিকের বদলে হিন্দু আর মুসলমান সম্প্রদায় বাস করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা হিন্দুদের কুপিয়ে দেশছাড়া করছে। এই বয়ান হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিতে সুবিধা দেয়।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ফ্যাসিস্ট চরিত্রের কারণে এই রাষ্ট্রের সকল নাগরিক সমানভাবে নিপীড়িত ও নির্যাতিত—এই সত্যটাকেও আড়াল করা যায়। সরকারের চিন্তার বাইরের রাজনৈতিক চিন্তার লোকেরা যে নিজের ভিটায় যেতে পারে না, মাঝে-মধ্যে সেই সত্যটাও আড়াল হয়ে যায়। গুম, অপহরণ, ক্রসফায়ার, জেল-জুলুম আর গুলিতে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায় অনেক বেশি নির্যাতিত হয়েছে, তার যে অনেক বেশি রক্ত ঝরছে, জীবন গেছে, সেই সত্যটাও আড়াল হয়ে যায়।

ইন্ডিয়ান এই যুক্তির পক্ষে তাঁরা যে তথ্য হাজির করে, তা হচ্ছে— বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা কমছে, তারা দেশত্যাগ করছে। অথচ বাংলাদেশে খ্রিস্টান এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সংখ্যা বাড়ছে। এমনকী শেষ সেনসাসে বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী মুসলমানদের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। ধর্মীয় নির্যাতনই যদি জনসংখ্যা কমার একমাত্র কারণ হতো, তাহলে বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান জনসংখ্যা বাড়ার কোনো কারণ ছিল না। এর কারণ অন্য কোথাও।

কলকাতার বর্ণ-হিন্দুরা মুসলমানদের সাথে থাকতে চায়নি ১৯৪৭-এ। তাঁদের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে চায়নি। তাই মুসলমানরা না চাইলেও হিন্দুদের জেদের কারণে বাংলা ভাগ হয়েছে। হিন্দুরা মুসলমানের সাথে এক দেশের নাগরিক হয়ে থাকবে না, তাই তাঁরা সেই সময় থেকে দেশত্যাগ করছে। এটা সম্প্রদায়গত সচেতন সিদ্ধান্ত। কিন্তু এর দায় চাপাতে চায় বাংলাদেশের মুসলমানদের ওপর। এখানে বাঙালি মুসলমানের কোনো দায় নেই। ভারতের হিন্দুত্ববাদ ভারত রাষ্ট্রকে হিন্দুদের পিতৃভূমি এবং পবিত্রভূমি বলে দাবি করে। তাই এই রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রে বসবাসরত সংখ্যালঘু হিন্দুদের মনে একটা বিকল্প নাগরিকত্বের সম্ভাবনা জাগরুক রাখে। তাঁরা ভারত রাষ্ট্রকে অবচেতনে নিজের পলিটিক্যাল এজেন্ট হিসেবে ভাবতে থাকে। ভারত রাষ্ট্র হিন্দুত্ববাদ দিয়ে তাঁদের এক তীব্র ধর্মীয় জজবায় আকর্ষণ করতে থাকে। একইভাবে শ্রীলঙ্কান তামিলদের ভারতে মাইগ্রেশনের একটা টেন্ড আছে। নেপাল থেকে হিন্দুদের তো ভারতে মাইগ্রেশন হয় না। কারণ তারাই তাঁদের রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ।

‘আমরা বাংলাদেশে মুসলমানের লগে মিলামিশা থাকুম’ এই চিন্তা হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যেদিন থেকে শুরু হবে, সেদিন বাংলাদেশে নতুন জমানার শুরু হবে। হিন্দু নির্যাতনের ইন্ডিয়ান রেকর্ড বাজিয়ে বাংলাদেশে পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন আনতে পারবে না। এটা যত তাড়াতাড়ি বাম, সেক্যুলার ও চেতনাজীবীরা বুঝবে ততই হিন্দুদের মঙ্গল।

এই সত্য কথাটা কি জন্য পিনাকী বাম সেকুলার চেতনাবাজ আর শিবসেনাদের কাছে হিন্দুবিদ্বেষী হয়ে যায়, সেটাই আশ্চর্যের বিষয়!

এই ভূখণ্ডে প্রথম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কোথায় হয়?

আমাকে অনেক আগে এক আওয়ামী লীগের নেতা গলা কাঁপিয়ে বলেছিল—জানেন, আমাদের ময়মনসিংহ এমন প্রগতিশীল এলাকা যে, এখানে জীবনেও কখনো সাম্প্রদায়িক সমস্যা হয়নি? আমি বলছিলাম—না জানতাম না, এইমাত্র জানলাম।

আজ পড়তে পড়তে জানলাম, এ ভূখণ্ডের সবচেয়ে ভয়াবহ প্রথম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল ১৯০৭ সালে কুমিল্লা আর জামালপুরে। এই দাঙ্গা এত ভয়াবহ ছিল যে, ইংল্যান্ডের হাউস অব কমন্সে এ দাঙ্গা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

কারণ কী ছিল জানেন? খুবই অদ্ভুত! কংগ্রেস কর্মীরা দরিদ্র মুসলমানদের স্বদেশি পণ্য ব্যবহারে বাধ্য করছিল আর বিদেশি পণ্য মুসলমান ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কাছে থেকে জোর করে কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে দিত।

সারা দেশেই এ ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। পুলিশের নথি থেকে জানা যায়, ১৯০৫ সালে শুধু নভেম্বর মাসেই বরিশালে বিদেশি পণ্য কেনার অপরাধে স্বদেশি কংগ্রেস কর্মীরা স্থানীয় মুসলমানদের ওপর হামলা করে ষাট বার। রবীন্দ্রনাথের ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসে এই ধরনের ঘটনার উল্লেখ আছে।

এ উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যার জন্য হিন্দু ঐতিহাসিকদের তরফ থেকে একতরফা মুসলমানদের দায়ী করা হয়। তাদের ভাবখানা এমন যে, ‘আমরা তোমাদের পিটাইবো তোমরা ব্যথা পাইবা কেন?’

আওয়ামী লীগের সেই নেতা জীবিত নেই, তাই তাকে এটা জানাতে পারলাম না।

ভারতে মুসলমান নিপীড়ন বনাম বাংলাদেশে হিন্দু নিপীড়ন।

ভারতে মুসলমান নিপীড়ন হলেও ভারতের মুসলমানরা পাকিস্তানে যায় না। কিন্তু বাংলাদেশে হিন্দু নিপীড়ন হলে হিন্দুরা দলে দলে ভারতে যায়। কেন যায়? এই প্রসঙ্গে আমাদের সেকুলারদের বয়ান হচ্ছে—‘ভারতে আধুনিক ও প্রগতিশীল মানুষের শক্তিশালী অবস্থান’ আছে তাই।

খুব মজার বিষয়। হাসবো না কাঁদবো বুঝতে পারছি না। ভারতে এই আধুনিক ও প্রগতিশীল মানুষের অবস্থান এতই শক্তিশালী যে, একেকটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হাজার হাজার মুসলিম কোতল হয়ে যায়। শুধু মুসলিম না, কোতল হয় শিখ, কোতল হয় দলিত। তারপরেও ‘মেরা ভারত মহান’। বাংলাদেশ

কেন ভারতের মতো হচ্ছে না, কেন বাংলাদেশের মানুষ বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে ‘বন্দেমাতরম’ বলছে না, এই চিন্তায় তাদের ঘুম আসে না।

এই প্রশ্নের প্রধান উত্তর হচ্ছে, রাষ্ট্র সম্পর্কে ভারতের মুসলমান আর বাংলাদেশের হিন্দুদের বিপরীতমুখী চিন্তা। ভারতের মুসলমানরা ভারত রাষ্ট্রকে তাঁদের পলিটিক্যাল এজেন্ট বলে গ্রহণ করেছে। পাকিস্তান তাঁদের পলিটিক্যাল এজেন্ট নয়। তাই সে তার পলিটিক্যাল এজেন্ট ‘ভারত’ নামের রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যেই তাঁর সমস্ত রাজনৈতিক ফয়সালা করে নেয়ার চেষ্টা করে। সেই রাষ্ট্রকে ছেড়ে দিয়ে তাঁর সমস্যার সমাধান খোঁজে না। এটা ভারতীয় মুসলমানদের শক্তির দিক। এমনকী তাঁদের রাজনৈতিক ফয়সালার জন্য তাঁর মুসলিম আত্মপরিচয়কে সেকুলার জামা পরেও ঢেকে রাখার দরকার হয় না। ভারতের মুসলমানদের সেকুলাররা পুতু-পুতু করে রক্ষা করে না। ওরা বিপদ এলে নিজেরাই লড়াই করে। কখনো কখনো দলে দলে মরে, আবার ফিনিক্স পাখির মতো মাথা তুলে দাঁড়ায়।

ভারতের মুসলমানদের মতো বাংলাদেশের হিন্দুরা বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে তাঁর পলিটিক্যাল এজেন্ট ভেবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে তাঁর সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে অগ্রসর হলেই একমাত্র হিন্দুদের দেশত্যাগ বন্ধ হবে।

মালোয়েশিয়াকে সেকেন্ড হোম বানানো বা দেশে ভবিষ্যত নেই বলে যেসব উচ্চবিত্তরা দেশ ছাড়ছেন, একটা বিদেশি পাসপোর্ট হাতে পাওয়াকেই যারা জীবনের মোক্ষম ভাবছেন, তারাও এই একই মনোভাবে আক্রান্ত। তারাও বাংলাদেশকে তাঁদের পলিটিক্যাল এজেন্ট মনে করে না। তাঁরা মনে করে না যে, এই পোড়ার দেশে তাঁর বিকাশের কোনো শর্ত উপস্থিত আছে।

কেন আমি নিয়ম করে সকাল-বিকাল মুসলমানদের গালিগালাজ করি না।

তপন রায় চৌধুরী যখন ‘বাঙালনামা’ নিয়মিত ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশ করতেন, তখন প্রতিটি পর্ব প্রকাশিত হবার পর অসংখ্য চিঠি পেতেন। তিনি স্বীকার করেছেন, এরমধ্যে দুয়েকজন পত্র লেখক তাঁর ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন। বাঙালনামা বই আকারে প্রকাশিত হবার পরে তিনি প্রথম সংস্করণের নিবেদনে সেসব পত্রলেখকদের কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। তবে এটা উল্লেখ করার পরেই তিনি একটা খুব মজার বিষয় উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন—‘কিছু পত্রলেখকের চিঠিতে এক বিচিত্র বিদ্বেষ-প্রণোদিত মনোভঙ্গির প্রকাশ দেখেছি। অনেকেরই আপত্তি—মুসলমানদের আমি যথোচিত গালিগালাজ করিনি।’

কুমিল্লায় জন্ম নেয়া এই বিখ্যাত ভারতীয় ঐতিহাসিক আজ বেঁচে নেই। তাই সেসব পত্রলেখকের দল আমার প্রোফাইলে এসে সমালোচনার ঝড় তোলে, কেন আমি নিয়ম করে সকাল-বিকাল মুসলমানদের যথোচিত গালিগালাজ করি না।

স্বামী বিবেকানন্দের মুসলমান সমাজ সম্পর্কে মূল্যায়ন।

‘মুসলমানদের ভারত অধিকার দরিদ্র পদদলিতদের উদ্ধারের কারণ হইয়াছিল। এই জন্যই আমাদের এক-পঞ্চমাংশ ভারতবাসী মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। কেবল তরবারি আর বন্দুকের বলে ইহা সাধিত হইয়াছিল, একথা মনে করা নিতান্ত পাগলামি মাত্র।’

স্বামী বিবেকানন্দ, মাদ্রাজে ১৮৯৭ সালে ‘ভারতের ভবিষ্যৎ’ শীর্ষক বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

বিবেকানন্দের এই কোটেশন দেখে হিন্দু দাদারা যদি মনে করে থাকেন যে, আপনাদের ছোট করার জন্য আমি এটা খুঁজে বের করেছি, তাহলে ভুল করবেন। আর মুসলমান ভাইয়েরা যদি মনে করে থাকেন, আপনাদের কেবল গুণকীর্তন করা হয়েছে, তাহলে আপনারাও বিরাট ভুল করবেন। হিন্দুত্ব আর মুসলমানিত্ব থেকে কিছু সময়ের জন্য বের হয়ে ভারত এবং বাংলার ইতিহাসটা বোঝার চেষ্টা করুন, মঙ্গল হবে।

হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সংবলিত আসনের দাবি রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার পায়তারা।

যুগান্তরে ৮ এপ্রিল ২০১৭-এ একটি সংবাদ ছাপা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ‘জাতীয় সংসদে ৬০টি সংরক্ষিত আসন চায় হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ। এছাড়া তাদের সাত দফা দাবির মধ্যে অন্যতম আরো দুটি দাবি রয়েছে। এগুলো হলো-সংখ্যালঘু বিষয়ক পৃথক মন্ত্রণালয় ও সংখ্যালঘু কমিশন গঠন। শুক্রবার হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নবম জাতীয় সম্মেলন থেকে এসব দাবি জানানো হয়। রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে দুদিনব্যাপী এই ত্রি-বার্ষিক জাতীয় সম্মেলন থেকে রাজনীতিবিদ ও নাগরিক সমাজের নেতারা বলেন, জাতি-ধর্মের রোষানলে দেশ প্রায় ধ্বংসের পথে। আজ কেবল সংখ্যালঘুই আক্রান্ত নয়, মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আক্রান্ত, ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসম্প্রদায়িকতাও আক্রান্ত। সার্বিকভাবে গোটা বাংলাদেশই আক্রান্ত। এর বিরুদ্ধে সবাইকে একসঙ্গে লড়াইয়ে নামতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ রক্ষায় সংখ্যালঘুদের ন্যায্য অধিকার কড়ায়গলয় বুঝিয়ে দিতে হবে।’

এই দাবি তাঁরা কার কাছে জানালো? সম্মেলনে রাজনৈতিক দলগুলো সবাই এসেছে জামায়াত আর বিএনপি ছাড়া। যারা এসেছে তাঁরা সংহতি জানিয়েছে। আওয়ামী লীগ তো ছিলই, জাতীয় পার্টিও সংহতি জানিয়েছে। তাহলে যারা আসেনি তাঁদের কাছেই কি দাবি জানানো হচ্ছে? জামায়াত না হয় বুঝলাম তাঁদের অপছন্দের দল কিন্তু বিএনপিকে কেন সম্মেলনে দাওয়াত দিল না? এর যুক্তি কি? যুক্তি একটাই হতে পারে, এই হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ গড়াই হয়েছে দল হিসেবে বিএনপিকে বাঁশ দেয়ার জন্য। আর তো কোনো যুক্তি নেই।

তাঁদের দাবি নিয়ে তাঁরা বলছে, হিন্দু নেতা নির্বাচন করবে হিন্দুরাই এবং হিন্দুরা মুসলমান নেতাকে নির্বাচিত করবে না। এর চেয়ে সাম্প্রদায়িক বিভেদাত্মক কোনো দাবি হতে পারে?

সম্প্রদায়ের আলাদা আলাদা নির্বাচন তো রিপাবলিকান রাষ্ট্রের ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। এতে তো বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্রই থাকে না। আর তাঁরা বলে ‘মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ রক্ষায় সংখ্যালঘুদের ন্যায্য অধিকার কড়ায়গল্গায় বুঝিয়ে দিতে হবে’???!!! এটা তো বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্রের বারোটা বাজানোর তরিকা। এই দাবি তো এটাই বলে, হিন্দু আর মুসলমান একসাথে এক রাষ্ট্রে থাকতে পারে না। এই সর্বনাশা দাবি যেখানে তোলা হয়, সেখানে আমাদের বাম সেক্যুলাররা সবাই যায় আর সেই সম্মেলন উদ্বোধন করেন আমাদের সো-কন্ড বুদ্ধিজীবী রেহমান সোবাহান।

হিন্দু মুসলিম সমস্যা নিয়ে কী হিন্দু মুসলিম নেতরাই কথা বলতে পারবে?

কয়েকদিন আগে আমার লেখায় একজন কमेंট করে বলেছেন, আমি হিন্দু-মুসলিম সমস্যা নিয়ে লিখি কেন? আমি কী হিন্দু বা মুসলিম কোন সম্প্রদায়ের নেতা?

- আমার কোনো সম্প্রদায়ের নেতা হওয়ার খায়েশ নেই। আমি রাজনীতিকে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে ভাগ করি না, ভাগ করতে চাই না এবং করা ঠিকও মনে করি না। ফলে হিন্দু ইস্যুতে কথা বলার অধিকার কেবল হিন্দু নেতারই। আর মুসলমানদের বিষয় কেবল মুসলমান নেতারই হতে হবে—এই ভাগ করাকে আমি বিপজ্জনক মনে করি। আমি সাম্প্রদায়িক মানুষ নই। কোনো সম্প্রদায়ের এমন ‘নিজস্ব সংগঠন’ থাকাই সাম্প্রদায়িক। সেটা যদি নিপীড়িত সম্প্রদায়ের হয়, তাও সেটা সাম্প্রদায়িক। দেশের নাগরিক হিসেবে আমার চিন্তা ব্যক্ত করার পূর্ণ অধিকার আছে। আর হিন্দু-মুসলিমের বিভেদাত্মক অবস্থা যদি দেশের সামগ্রিক অবস্থাকে আরো সংকটে ফেলে; আর কেউ সেটা নিয়ে কোনো কথা বলতে চাইলে তাকে চুপ করে থাকতে বলাটা দুরভিসন্ধিমূলক।

বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায় এক জটিল সময় অতিক্রম করেছে। তাঁদের ওপর সহিংসতা বেড়েছে আগের চেয়ে অনেক বেশি। তাতে সন্দেহ নেই। এখন এই সমস্যার সমাধান কী?

হিন্দুরা নিপীড়িত হিসেবে তাঁদের সংগঠন করেছে এবং তাঁদের হিন্দু পরিচয়ের মধ্য থেকেই এই সমস্যার সমাধান খুঁজছে। কারণ, তারা মনে করছে, হিন্দুদের যেকোনো সমস্যায় হিন্দুরাই পাশে দাঁড়াতে পারে। এই অনুমান সেট্টোরিয়ান অর্থে সাম্প্রদায়িক ও বিভেদাত্মক এবং সর্বাংশে ভুল। এই কারণেই তারা বিভেদাত্মক একটি সংগঠন দিয়ে তাঁদের ওপর চলা বিভেদাত্মক নিপীড়নের কোনো সমাধান করতে পারছে না বা খুঁজে পাচ্ছে না। তাই তাঁদের সাত দফা দাবির প্রথম দাবিই হয়ে ওঠে সাম্প্রদায়িক দাবি। তারা দাবি করেছে—সংখ্যালঘুদের জন্য সংসদে ৬০টি আসন সংরক্ষণ করা এবং প্রশাসনিক কাঠামোর প্রতিটি স্তরে ২০ শতাংশ সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের পদায়ন। এই কথার অর্থ হলো, তারা বাংলাদেশকে একটা একক রাষ্ট্র হিসেবে রেখে নাগরিক হিসেবে সমাধান চায় না। নাগরিক পরিচয়কে ভেঙে সাম্প্রদায়িক পরিমণ্ডলে হিন্দুদের জন্য ভেঙে ভেঙে রাষ্ট্রের আলাদা হিস্যা চায়।

ধর্ম পরিচয় ছাড়াও সমাজে অসংখ্য বিভেদ থাকে। এই বিভেদের ওপরে উঠে আমরা এক পলিটিক্যাল কমিউনিটি তৈরি করি, যেটাকে রাষ্ট্র বলে। হিন্দু বা মুসলমানের রাষ্ট্রচিন্তায় যদি রাজনৈতিক বিভেদগুলোই প্রধান করে তোলা হয়, নিরসনে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার উপায় না থাকে, প্রস্তাব না থাকে, তাহলে ধরে নিতে হবে রাষ্ট্র গঠনের গোড়ায় কোনো গলদ আছে। ফলে নতুন রাষ্ট্র সেখানে সম্ভব নয়। আগে থেকে হয়ে থাকা রাষ্ট্র থাকলে সে রাষ্ট্রও টিকবে না, তা আগেই বলা যায়।

রাষ্ট্র গঠন মানে রাজনৈতিক সমাজ তৈরি, যেই রাজনৈতিক সমাজে সকল নাগরিক তার সাম্প্রদায়িক পরিচয় নয়, নাগরিক পরিচয়ে অংশ নেবে। সেই রাজনৈতিক সমাজ বা পলিটিক্যাল কমিউনিটি বা রাষ্ট্র গঠনের কাজই আমাদের আশু কর্তব্য।

হিন্দু সম্প্রদায়কেও এই পলিটিক্যাল কমিউনিটি গড়ার কাজে অন্য সকলের সাথে মিলে অংশ নিতে হবে। পলিটিক্যাল কমিউনিটি বিষয়টার রাজনৈতিক ও সামাজিক গভীরতা বুঝে কাজ করতে হবে। সর্বোপরি তার নাগরিক পরিচয়কে মুখ্য করতে হবে বা উর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে।

‘আমরা হিন্দু, আমাদের ওপর মুসলমানরা অবিচার করছে’—এমন ভাষায় অভিযোগ কেউ করতে পারে। কিন্তু আমি হিন্দু হিসেবে এর সমাধান হিন্দু কায়দায় চাই, হিন্দুদের আলাদা কোটায় চাই—এভাবে আমরা বলতে পারি না। এভাবে বললে তখন সেই নালিশ সাম্প্রদায়িক বা বিভেদমূলক নালিশ হবে। এবং প্রত্যাশিত সমাধান হবে সাম্প্রদায়িক সমাধান। এর উদ্দেশ্য যাই হোক, পরিণাম ভালো হয় না। কারণ, এই ধারার নালিশের মানসিকতাটাই বিভেদাত্মক। অথচ বাস্তবে হিন্দু সম্প্রদায়ের সকল নালিশ ও অভিযোগ এই অবস্থানের ওপর দাঁড়িয়ে। এই অবস্থান কোনো সমাধান দিতে পারবে না। এমনকি পারছেও না। আবার অবাক বিষয় হচ্ছে, তার নিজের সমস্যার সাম্প্রদায়িক সমাধান চাইলেও সে ঘোষণা করে যে, সে চায় একটা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ। সাম্প্রদায়িক সমাধান দিয়ে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ কীভাবে সম্ভব হতে পারে তা বোধগম্য নয়।

হিন্দু সম্প্রদায়কে বলতে হবে—‘আমি এই দেশের নাগরিক এবং আমরা এমন একটা রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চাই, যেই রাষ্ট্রে বিভেদাত্মক আচরণের শিকার হওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না।’

বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায় কী এই জরুরি কাজ করতে রাজি আছে?

বিচার মানি তালগাছ আমার।

‘হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ’ মনে করে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম হওয়ার কারণে তারা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়ে গেছেন। যদিও কোনোদিন তারা স্পষ্ট করে বলেননি রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম হওয়ার কারণে রাষ্ট্রের চরিত্রে কী কী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

আমি তাদের কনসার্ন আমলে নেয়ার পক্ষে। তারা বলেন, ৭২-এর সংবিধান অবিকৃতভাবে পুনর্বহাল করতে হবে। যেই সংবিধানের ভিত্তি বাঙালি জাতীয়তাবাদ। সেই সংবিধান যে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সকলকে এক খোঁচায় দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বানিয়ে দেয়, সেটা তাদের নজরে আসে না। বাঙালি জাতীয়তাবাদ এটা কিন্তু রাষ্ট্রের ভিত্তি, নিছক পোশাকি রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা নয়; যেই রাষ্ট্রধর্ম ইংল্যান্ডেও আছে। তাদের ভাবখানা এমন—আমার হিস্যা ঠিক থাকলেই সহি।

মৌলবাদ

মৌলবাদ শব্দটা কীভাবে এলো?

কিছুদিন আগে দাওয়াত পেয়ে এক বন্ধুর বাসায় গেলাম। তখন সারা দেশের হট টপিক ছিল ‘কাশেম বিন আবু বাকার’। তখন সেই বন্ধুর বাসায় আলাপ চলছিল কাশেম সাহেবকে নিয়েই। আমি বলছিলাম, কাশেম সাহেব পুরোদস্তুর মর্ডানিস্ট। এই আলাপটা যখন এগুচ্ছে, তখন হুট করে একজন এসে বলে বসলেন, আপনি হচ্ছেন মৌলবাদী। লোকটাকে আমি চিনতাম না, হঠাৎ তার লেখা আমার নিউজফিডে এলো। দেখলাম, এই লোকটা তো সেই লোক। তার পরিচয়ও দেখলাম, আমার সেই বন্ধুর প্রতিষ্ঠানেই চাকরি করেন।

তার চেহারাটা নিউজফিডে দেখে আমাকে দেয়া সেই মৌলবাদী অভিধার কথা মনে হতেই হাসি পেলো।

তিনি না জানতেই পারেন যে, ‘মৌলবাদ’ তত্ত্বটাই একটা আমেরিকান তত্ত্ব। এর উদ্ভব ও বিকাশ আমেরিকান সমাজেই। এমনকী আমেরিকা রাষ্ট্র গঠনেও মৌলবাদের ভূমিকা আছে বলে অ্যাকাডেমিশিয়ানদের অনেকেই মনে করেন।

এই শব্দটার জন্ম দেয় আমেরিকার মুডি বাইবেল ইন্সটিটিউট এবং তার ভাবাদর্শের অনুসারী নায়াথ্রা বাইবেল কনফারেন্স। মুডি বাইবেল ইন্সটিটিউটের মূল কথা ছিল বাইবেলকে অদ্রান্ত ধরে নিতে হবে, তার কোনো কিছু নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা যাবে না। পরবর্তীতে ১৮৯৫ সালে নায়াথ্রা বাইবেল কনফারেন্স বাইবেলের পাঁচটি মূল সূত্রকে খ্রিস্টান ধর্ম বিশ্বাসের ফাউন্ডামেন্টাল বলে ঘোষণা করে। এগুলো হচ্ছে—

১. বাইবেল অদ্রান্ত
২. খ্রিস্ট দিব্যরূপে পূজ্য।
৩. মাতা মেরির কৌমার্য প্রব সত্য
৪. খ্রিস্টের অপসরণ বিকল্পমূলক
৫. খ্রিস্টের সশরীর পুনরাবির্ভাব আসন্ন

এই পাঁচটি মূল সূত্রকে ব্যাখ্যা করে ১৯০৯ সালে ডিকশন ও টোরের সম্পাদনায় বারো খণ্ডের বই প্রকাশিত হয়। নাম- দ্য ফাভামেন্টালিস: এ টেস্টিমনি টু দ্য ট্রুথ। এরপর থেকেই এই নতুন ধারার খ্রিস্টবাদীদের ফাভামেন্টালিস্ট এবং তাদের মতবাদকে ফাভামেন্টালিজম বলা হয়।

এই ডিকশন ও টোরেই পরে ঘোষণা করেন, আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতাদের ধর্মীয় আদর্শই আমেরিকার ভাবাদর্শ। তারা বললেন,

America was founded by men of faith on Godly principles.

এই গডলি প্রিন্সিপল বা ঐশ্বরিক নীতিই হচ্ছে সেই পাঁচটা মৌল আদর্শ যা দ্য ফাভামেন্টাল গ্রন্থে বলা হয়েছে।

আমেরিকান ভ্যালুজ বা আমেরিকান ওয়ে অব লাইফ বলতে যা বোঝায়, তা আসলে পুঁজিবাদ বা ক্যাপিটালিজমের কালচারাল ফর্ম বা সাংস্কৃতিক রূপ, আর তা হচ্ছে প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানিজম ছাড়া আর কিছুই না। মার্কিন ধনতন্ত্র আর খ্রিস্ট ধর্ম পরস্পরের হাত ধরে চলে। এই ক্যাপিটালিজমের টিকি বাঁধা আছে ওই পাঁচটা ফাভামেন্টালে। তাই আমেরিকান জীবন ও মূল্যবোধ মৌলবাদী বটেই।

মৌলবাদী কে? মৌলবাদের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক থাকা কি আবশ্যিক?

মৌলবাদী কে? মৌলবাদের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক থাকা কি আবশ্যিক? আমাদের দেশের এক ধরনের মানুষের ধারণা মৌলবাদ শুধু ধর্মের বিষয়। পৃথিবীতে যেকোনো আদর্শকে ঘিরে মৌলবাদ-সহিংসতা জন্ম নিতে পারে। শুধু নিতে পারে বললেও ভুল হবে। মৌলবাদ ও সহিংসতার উত্থানের উৎস হিসেবে বৌদ্ধ ধর্মও মুক্ত নয়, সমাজতন্ত্রও মুক্ত নয়। যখন কেউ বলে ‘সমাজতন্ত্র অভ্রান্ত’, এটাই হয়ে ওঠে মৌলবাদ। আর যখন বলা হয়, ‘সমাজতন্ত্রই ইতিহাসের নিয়তি’ তখন এটা হয়ে ওঠে নিয়তিবাদ। আদর্শ মানে জীবনের কমপ্লিট কোড, এর বাইরে কোনো সত্য নেই। ‘আদর্শ’ মানে অতিন্দ্রীয় শুদ্ধ ধারণা, যা শ্রেষ্ঠ। তাই আদর্শকে শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিতে হয়। শ্রেষ্ঠত্বের জন্য যদি রক্তপাতের প্রয়োজন হয়, আদর্শের অনুসারীরা সেটা করতে পিছপা হন না। ‘আদর্শই মূল্যবান’—এই প্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে আদর্শের নিচে ফেলে তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে আদর্শের কোনো গ্লানি নেই। আদর্শবাদীর কাছে আদর্শের মূল্য আছে, মানুষের নেই।

ধর্মবাদীদের কাছে মানুষের চেয়ে ধর্ম বড় হয়ে উঠলেই ধর্মের নামে মানুষ খুন করে ফেলে অবলীলায়। মানুষের চেয়ে জাত বড় হয়ে উঠলেই কনসেন্সেশন ক্যাম্পে হিটলার মানুষ পোড়ায়। মানুষের চেয়ে সমাজতন্ত্র বড় হয়ে উঠলেই খেমার রুজের মতো হিংস্র দানব গণহত্যায়ে মেতে ওঠে। মানুষের চেয়ে দল বড় হয়ে উঠলেই দলের অনুসারীদের দল রক্ষায় হয়ে উঠতে হয় হিংস্র, মৃত্যু স্ফুদায় তড়পাতে থাকা পিশাচ, রক্তের নেশায় ঘুরতে থাকা ভ্যাম্পায়ার; অন্ধকারেই যার জীবন শুরু।

এখন সময় অন্ধকারের! তাই অন্ধকারের শক্তির ‘আদর্শ’ দেখে।

আলোর দিশারীরা মানুষ দেখে, শুধু মানুষ।

‘মৌলবাদ’ বলতে কী বোঝায়?

‘মৌলবাদ’ বলতে কী বোঝায়? কোনো ওয়ার্কিং ডেফিনেশন আছে কিনা সেটা জানতে মোটামুটি বাংলা আর ইংরেজি মিলিয়ে ছয়টা বই চষে ফেললাম। বইগুলোর কভারে মৌলবাদ বা ফান্ডামেন্টালিজম লেখা ছিল। হতাশ হলাম কোথাও মৌলবাদ শব্দটির ওয়ার্কিং ডেফিনেশন নেই। কোনো বইয়ের কভারে মৌলবাদ লেখা থাকলেই সেখানে সংজ্ঞা থাকা উচিত কিনা সেই তর্ক কেউ তুলতেই পারেন। আমি আসলে বইগুলো যখন কিনেছি তখন দোকানের ক্যাটালগ দেখে শিরোনামে ‘মৌলবাদ বা ফান্ডামেন্টালিজম’ লেখা আছে এমন ছয়টা বই পেয়েছিলাম। সবগুলোই কিনেছিলাম সেদিন।

শেষে ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড আমেরিকান কালচারে খুঁজে পেলাম সেই ওয়ার্কিং ডেফিনেশন।

‘The demand for a strict adherence to certain theological doctrines, in reaction against Modernist theology’

‘আধুনিক ধর্মতত্ত্বের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ায় নির্দিষ্ট আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলোর প্রতি কঠোর আনুগত্যের জন্য দাবি।’

‘মর্ডানিস্ট থিওলজি’ বা আধুনিক ধর্মতত্ত্বের উল্লেখটা লক্ষ্যণীয়। মৌলবাদের সংগ্রাম ধর্মের আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম, যেখানে এক পক্ষ ধর্মকে আধুনিকায়নের নামে বদলে দিতে চায়, আরেক পক্ষ সেটাকে প্রতিরোধ করে।

মৌলবাদের সংগ্রাম তাই প্রত্যক্ষভাবে আধুনিক সমাজ বা রাষ্ট্রের সাথে নয়; মৌলবাদের সংগ্রাম ‘মর্ডানিস্ট থিওলজি’র বিরুদ্ধে। আর এই ‘মর্ডানিস্ট থিওলজি’ হচ্ছে এনলাইটেনমেন্টের সন্তান।

মর্ডানিস্ট থিওলজির জন্ম পুঁজিবাদের হাত ধরে, যার উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃতি শোভন সম্পর্ককে খতম করে দেয়া। কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোতে মার্ক্স তাই লিখেছিলেন—‘বুর্জোয়া শ্রেণীর যখনই ক্ষমতা হয়েছে, সেখানেই সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক, পিতৃতান্ত্রিক ও প্রকৃতি শোভন সম্পর্ক খতম করে দিয়েছে। যেসব বিচিত্র সম্পর্কে মানুষ বাঁধা ছিল তার উপরওয়ালাদের কাছে, তা তাঁরা ছিঁড়ে ফেলেছে নির্মমভাবে।’

কমিউনিস্ট দলগুলোর সমস্যা

ভারতীয় কমিউনিস্টদের বর্ণবাদীতা।

‘ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সর্বোচ্চ নেতৃত্বের একজন মন্ত্রী একবার এই রাজ্যের একটি বিশিষ্ট কালীমন্দিরে গিয়েছিলেন এবং তিনি যখন মন্দির থেকে বেরিয়ে আসছেন, তখন সেখানে জড়ো হওয়া সাংবাদিক তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘আপনি তো কমিউনিস্ট, অথচ দেবী মন্দিরে পূজা দিতে এসেছেন?’ উনি উত্তরে বলেছিলেন-‘আমার প্রথম পরিচয় আমি ব্রাহ্মণ এবং আমার দ্বিতীয় পরিচয় আমি কমিউনিস্ট’।^৩

একজন কমিউনিস্ট ঈশ্বর বিশ্বাসী হতে পারেন, তার ধর্ম পালন করতে পারেন, এতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু কমিউনিস্টরা কি বর্ণবাদী হতে পারেন? জন্মসূত্রে পাওয়া উচ্চবর্ণের অহংকার তো নিরেট রেইসিজম বা বর্ণবাদ।

কমিউনিস্টরা চায় ‘শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভক্ত সমাজ’ উচ্ছেদ করে ‘সাম্যের সমাজ’ গড়তে। যেখানে জাতপাত, অর্থনৈতিক অসাম্য থাকবে না। হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রম প্রথা থেকে উদ্ভূত উচ্চবর্ণের জন্মসূত্রে পাওয়া ব্রাহ্মণ পরিচয় তো পুঁজিবাদের বুর্জোয়া পরিচয়ের চেয়ে পশ্চাৎপদ। আপনি পুঁজিবাদে অর্থবিশ্বের মালিক হতে পারলে জন্মসূত্রে পাওয়া পশ্চাৎপদ অবস্থাকে আপনি উৎরে যেতে পারেন কিন্তু বর্ণাশ্রমে সেটার সুযোগই নেই। আপনাকে ধরে নিতে হবে তিনি যেহেতু ব্রাহ্মণ, তাই তিনিই আপনার চেয়ে উন্নত মানুষ। সেই পশ্চাৎপদ বর্ণাশ্রমের ব্রাহ্মণ পরিচয় একজন কমিউনিস্টের পরিচয়ের সাথে কোনোভাবেই মিলবে না, এটা সাংঘর্ষিক। অথচ তিনি কি বিপুল গৌরবে তার কমিউনিস্ট এবং ব্রাহ্মণ-দুই পরিচয়কেই ধরতে চান। তিনি দুধ আর তামাক একসাথেই খাবেন!

^৩. আমার জীবন কিছু কথা; কান্তি বিশ্বাস (তিনি সিপিএমের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন দীর্ঘদিন), একুশ শতক, কোলকাতা, অক্টোবর ২১০৪, পৃষ্ঠা: ১৩২।

কোরআন-সুন্নাহর খেলাফ হয়, সিপিবিও এমন কোনো অর্জন চায়নি ১৯৫৩-এ

পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ, শেরে-বাংলার কৃষক-শ্রমিক পার্টি, সোহরাওয়ার্দী, গণতন্ত্রী দল, নেজামে ইসলাম পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), খেলাফত রব্বানী পার্টি একসাথে ঐক্য গড়ে নির্বাচন করে। এই ফ্রন্ট হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর যুক্তফ্রন্ট নামে পরিচিতি পায়।

যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়। সিপিবি এই বিজয়ের গল্প এখনো বলে বেড়াচ্ছে।

আমার আলোচনার বিষয় সেটা নয়। এই যুক্তফ্রন্টের একটা সর্বসম্মত ঘোষণা ছিল, যার নাম ছিল ‘২১ দফা’।

এই ২১ দফা প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বরে। এই ২১ দফার নীতি কী ছিল জানেন? ২১ দফার প্রথমেই সেটা লেখা ছিল, যেখানে ‘সিপিবি’ একমত হয়েছিল। আজ অবাক হবেন সেই নীতি পড়ে।

২১ দফার নীতি: কোরআন ও সুন্নাহর মৌলিক নীতির খেলাফ কোনো আইন প্রণয়ন করা হবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবনধারণের ব্যবস্থা করা হবে।^৪

সিপিবি কি একটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল?

এমন একটা শিরোনাম কেন দিতে হলো, সেটা বুঝতে হলে পুরো লেখাটা পড়তে হবে।

আমার একজন সাবেক ফেইসবুক বন্ধু তাকে আনফ্রেন্ড করাতে মন খারাপ করে স্ট্যাটাস দিয়েছেন। তিনি যদি মনে করে থাকেন, তাঁকে অপমানিতে করার জন্য আনফ্রেন্ড করেছি, তাহলে সেটা আমার ওপর অবিচার করা হবে। আমি কাউকেই অপমান করি না। আমার শত্রু-মিত্র, কাউকেই না। আমি কঠোর সমালোচনা হয়তো করি, কিন্তু কোনো অর্থেই মর্যাদাহানী করি না। যিনি আমার মর্যাদাহানীকর স্ট্যাটাসে লাইক দেন এবং মনে করেন, আমার মর্যাদাহানী তাকে পীড়িত করেছে, তখন তাঁর বন্ধু তালিকা থেকে তাঁর সম্মান রক্ষার্থে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিই।

তিনি আমার ছাত্র জীবনের সংগঠন ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ছিলেন, এখন সিপিবি’র সঙ্গে আছেন। এই দুই সংগঠনকে আমি তাদের তরফ থেকে আক্রান্ত না হলে জ্ঞানত কখনই আঘাত করবো না। এটা আবেগ থেকেই। কিন্তু সেই স্ট্যাটাসে তিনি অভিযোগ করেছেন যে, তিনি জানতে পেরেছেন প্রগতিশীলদের আমি আনফ্রেন্ড করছি।

^৪. বাংলাদেশের রাজনীতি প্রকৃতি ও প্রবণতা: ২১ দফা থেকে ৫ দফা; সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, জুন ১৯৮৭, পৃষ্ঠা: ১২৭।

তাঁর বক্তব্যে একটা প্রশ্ন মনে এসেছে। সিপিবি কি একটা প্রগতিশীল দল? সিপিবি করা একজন কি প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী?

ইংরেজিতে ‘প্রোগ্রেসিভ’-এর বাংলা করে আমরা বলি ‘প্রগতিশীল’। বাংলাদেশের সকল বামপন্থি নিজেদের প্রগতিশীল বলে দাবি করে। আসলে প্রোগ্রেসিভ মানে কী? রাজনীতিতে প্রোগ্রেসিভ মানে যারা গ্রাজুয়ালি সোশ্যাল রিফর্মের পক্ষে। প্রোগ্রেসিভরা বিপ্লব করে সামাজিক পরিবর্তন চায় না। তাঁরা বিপ্লবী নয়। রুজভেল্ট, ওবামা, ক্যামেরন-সবাই নিজেকে প্রোগ্রেসিভ বলে দাবি করেন। বৃটেনের লেবার পার্টি নিজেদের সোশ্যালিস্ট বলে পরিচয় দিতে লজ্জা পেত, তাই তাঁরাও একসময় নিজেদের প্রোগ্রেসিভ বলে পরিচয় দেয়া শুরু করেন। পৃথিবীর প্রথম প্রোগ্রেসিভ আন্দোলন হয় ইউরোপে হেগেলের অনুসারীদের মাধ্যমে। প্রগতিশীলতা সর্বতোভাবেই একটি বুর্জোয়া ধারণা। পাশ্চাত্যে প্রগতিশীল রাজনীতির যে চারটি স্তম্ভ আছে বলে বলা হয়, তা হচ্ছে—ফ্রিডম, অপর্চুনিটি, রেস্পন্সিবিলিটি এবং কো-অপারেশন। প্রগতিশীলতার এই আধুনিক ধারণা আসে আমেরিকা থেকে। আমেরিকান ভ্যালু প্রজেক্ট অনেক খরচ করে সেই প্রজেক্ট থেকে Progressive Thinking: A Synthesis of Progressive Values, Beliefs, and Positions নামে বই প্রকাশ করে। সেই বইয়ে পাশ্চাত্য প্রগতিশীলতার উপরোক্ত সংজ্ঞায়ন করা হয়।

সিপিবি তাঁদের ঘোষিত লক্ষ্য বিচারে একটি বিপ্লবী দল। তাঁরা শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং বাংলাদেশে তাঁরা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে আশুকর্তব্য হিসেবে ঘোষণা করেন। সবগুলোই তো বিপ্লবী কর্তব্য; এখানে সামাজিক রিফর্মের স্থান কোথায়? তাহলে নিজেদের বিপ্লবী না বলে, প্রগতিশীল বলে ঘোষণা করার কারণ কী? এটা কি লেবার পার্টির মতো রিডেফিনেশন?

ঘটনাটা বোঝা যায় তাঁর একটা মন্তব্যে। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে লেখেন—‘আমি ভালো করেই জানি আমার শত্রু কে? দেশদ্রোহী রাজাকার, জামাত-শিবির তথা ধর্মান্ধ, সাম্প্রদায়িক অপশক্তি আমার শত্রু। আমার যা কিছু কর্মকাণ্ড তা এদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়।’

পৃথিবীতে এমন কোনো কমিউনিস্ট নেই, যারা শত্রু হিসেবে সাম্রাজ্যবাদ এবং তাঁদের দেশীয় দোসর লুটেরা বুর্জোয়াদের ঘোষণা করেনি। কমিউনিস্টরা শ্রমিক-শ্রেণীর বিপ্লবী দল হওয়ার কারণে শ্রমিক-শ্রেণীর সাপেক্ষে তাঁর শত্রু-মিত্র নির্ধারণ করে। বড়ই দুঃখ হয়, যখন সিপিবি’র শিক্ষায় শিক্ষিত একজন এভাবে তাঁর শত্রু ঘোষণা করে।

কমরেড; আমি নই, আপনিই পথ হারিয়েছেন। আপনি আপনার আদর্শ এবং আদর্শের শিক্ষা হয় আত্মস্থ করতে পারেননি অথবা পুরোপুরি ত্যাগ করেছেন। সঠিক পথে আসুন, একজন কমিউনিস্টের দৃষ্টিতে বিশ্বকে দেখুন।

স্বাধীন বাংলাদেশের বিরোধীতায় সিপিবি।

মওলানা ভাসানী ১৯৭০ সালের ৪ ডিসেম্বর ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় ‘স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান-এর দাবি উত্থাপন করেন।

ভাসানীর এই দাবিকে সিপিবি সমালোচনা করেছিল। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার মাত্র একমাস আগে ১৯৭১-এর ২৫ ফেব্রুয়ারিতে সিপিবি (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি) ৫ দফা দাবি তোলে। তার তৃতীয় দফায় তিনি লেখেন—

‘জাতীয়তাবাদী তথাকথিত স্বাধীন পূর্ব বাঙলার নামে অবাঙালি বিরোধী জিগির তুলিয়া এবং মওলানা ভাসানী স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের আওয়াজ তুলিয়া জনগণের মনে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের বিরোধী মনোভাব গড়িয়া তুলিয়া অবস্থাকে আরো জটিল ও ঘোলাটে করিয়া তুলিতেছে।’

মুক্তিযুদ্ধ শুরুর একমাস আগে যখন গোটা জাতি স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় কাঁপছে, তখন সিপিবি’র এই বিপ্লবী (!) বয়ানের ব্যাখ্যা কী?৫

বাংলাদেশের বামপন্থীদের স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান।

বাংলাদেশের বামপন্থিরা বলেন, তাঁদের নাকি স্বাধীনতা যুদ্ধে অনেক অবদান ছিল। প্রখ্যাত বামপন্থি নেতা নির্মল সেন বামপন্থিদের মুক্তিযুদ্ধে অবদান নিয়ে মূল্যায়ন করেছিলেন—

‘৭১-এর সংগ্রামে আমাদের তেমন কোনো ইতিবাচক ভূমিকা ছিল না। আমরা আমাদের শ্রমিকদের ৭১-এর সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলাম কি? আদৌ নয়। আমি ইতিপূর্বে বারবার উল্লেখ করেছি বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা। এ ব্যাপারে তখনকার বিভিন্ন আত্মগোপনকারী বামপন্থি দলসহ ছাত্রলীগের নেতারাও আমাদের সাথে কথা বলেছেন। আমরা বারবারই বলেছি, স্বাধীন বাংলাদেশের রূপরেখা আমরা জানতে চাই। আর আমরা আরেকটা পাকিস্তান গড়তে চাই না। আমরা শোষণমুক্ত বাংলাদেশ চাই। এ কথায় আমাদের সাথে আলোচনা ভেঙে গেছে।

আমাদের ভূমিকা ওই পর্যন্তই। এরপরে আমরা দেশ স্বাধীন করার নিজস্ব কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করিনি। হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকেছি। ১৯৭১ সালে সংগ্রাম শুরু হওয়ার পর আমরা গডালিকা প্রবাহে ভেসে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধা সেজেছি। আমার জানা মতে, এটাই ছিল মোটামুটিভাবে বামপন্থিদের ভূমিকা।’৬

৫. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৫৩-৫৪

৬. নির্মল সেন, আমার জবানবন্দি; ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃষ্ঠা: ৫৭৫

হিন্দু মহাসভার বয়ান কেন মণি সিংহের মুখে?

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টের ভয়াবহ দাঙ্গার কথা আমরা জানি। ঐ দিন মুসলিম লীগ ‘ডাইরেক্ট অ্যাকশন’ কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল। কর্মসূচিটি কার বিরুদ্ধে ছিল? মুসলিম লীগের বক্তব্য হলো— ওটা ছিল ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে ডাইরেক্ট অ্যাকশন। ব্রিটিশ সরকার ও ক্যাবিনেট মিশনকে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল যে, ভারতবর্ষের দশ কোটি মুসলমান পাকিস্তান দাবি আদায় করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা উল্টো বুঝিয়ে বললো—‘এই কর্মসূচি হিন্দুদের বিরুদ্ধে’। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট নেতা মণি সিংহও মনে করেন, ওই কর্মসূচি ছিল হিন্দুদের বিরুদ্ধে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন মুসলিম লীগের মাঠের কর্মী। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তের ঘটনার সাথে যুক্ত। ভয়াবহ দাঙ্গার মধ্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। তার বক্তব্য আর মণি সিংহের বক্তব্যের তফাৎ আকাশ-পাতাল। মণি সিংহের অনুসারীরা নিশ্চয়ই মনে করেন, ওই সংগ্রাম ছিল হিন্দুদের বিরুদ্ধে, যেমনটা মনে করে কংগ্রেস আর হিন্দু মহাসভা। কংগ্রেস আর হিন্দু মহাসভার বয়ানের সাথে কীভাবে একজন কমিউনিস্ট নেতার বয়ান একেবারে ভুলে মিলে যায়?

১৬ আগস্টের ঘটনা সম্পর্কে দুই নেতার ভিন্ন বয়ান। প্রথমটা অসমাপ্ত আত্মজীবনী থেকে, পরেরটা জীবন সংগ্রাম থেকে।

২৯ জুলাই জিন্নাহ সাহেব অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ কাউন্সিল সভা বোম্বে শহরে আহ্বান করলেন। অর্থের অভাবে আমি যেতে পারলাম না। জিন্নাহ সাহেব ১৬ আগস্ট তারিখে ‘ডাইরেক্ট অ্যাকশন-ডে’ ঘোষণা করলেন। তিনি বিবৃতি মারফত ঘোষণা করেছিলেন, শান্তিপূর্ণভাবে এই দিবস পালন করতে। ব্রিটিশ সরকার ও ক্যাবিনেট মিশনকে তিনি এটা দেখাতে চেয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষের দশ কোটি মুসলমান পাকিস্তান দাবি আদায়ে বদ্ধপরিকর। কোনোরকম বাধাই তারা মানবেন না। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার নেতারা এই ‘প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস’ তাদের বিরুদ্ধে ঘোষণা করা হয়েছে বলে বিবৃতি দিতে শুরু করলেন।

আমাদের আবার ডাক পড়লো এই দিনটা সুষ্ঠুভাবে পালন করার জন্য। হাশিম সাহেব আমাদের নিয়ে সভা করলেন। আমাদের বললেন—

‘তোমাদের মহল্লায় মহল্লায় যেতে হবে, হিন্দু মহল্লায়ও তোমরা যাবে। তোমরা বলবে, আমাদের এই সংগ্রাম হিন্দুদের বিরুদ্ধে নয়, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে, আসুন আমরা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এই দিনটা পালন করি।’

আমরা গাড়িতে মাইক লাগিয়ে বের হয়ে পড়লাম। হিন্দু ও মুসলিম মহল্লার সমানে প্রপাগান্ডা শুরু করলাম। অন্য কোনো কথা নেই, ‘পাকিস্তান’ আমাদের দাবি। এই দাবি হিন্দুর বিরুদ্ধে নয়, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে। ফরোয়ার্ড ব্লকের কিছু নেতা আমাদের বক্তৃতা ও বিবৃতি শুনে মুসলিম লীগ অফিসে এলেন এবং এই দিনটা যাতে শান্তিপূর্ণভাবে হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে পালন করা যায় তার প্রস্তাব দিলেন।

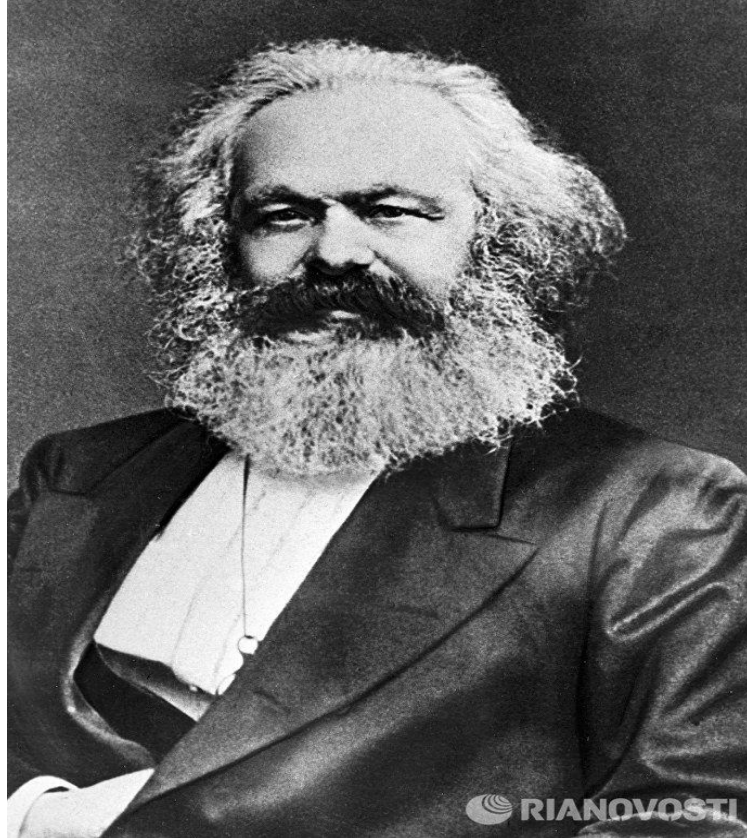
আমরা রাজি হলাম। কিন্তু হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের প্রপাগান্ডার কাছে তারা টিকতে পারলেন না। হিন্দু সম্প্রদায়কে বুঝিয়ে দিলেন এটা হিন্দুদের বিরুদ্ধে।^৭

‘১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টকে মুসলিম লীগ ‘প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস’ ঘোষণা করে। সংগ্রাম হিন্দুর বিরুদ্ধে। কলকাতা এবং অন্যান্য জায়গায় সে সময় বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত হয়।’^৮

সিপিবি ১৬ আগস্ট সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্যকে কি গ্রহণ করে, নাকি করে না? সিপিবি নেতা মণি সিংহ যে বয়ান দিয়েছেন, তা হিন্দু মহাসভার বয়ানের সাথে হুবহু মিলে যাওয়াটা কাকতালীয় নয়। সিপিবি ঐতিহাসিকভাবে এই ভূখণ্ডে হিন্দু স্বার্থের রাজনীতি করেছে। হিন্দু রাজনীতির যে বয়ান, সেই বয়ান সবসময় সিপিবির মুখে শোনা যায়। নামে যাই হোক, সিপিবি আসলে হিন্দু মহাসভা আর কংগ্রেসের বাংলাদেশি সংস্করণ বললে কি অতিকথন হবে?

সিপিবি নিজে কী ব্যাখ্যা দিতে চায়, আমরা শুনতে চাই। বাংলাদেশের ইতিহাস চর্চার জন্য এটা জানা জরুরি।

কার্ল মার্ক্স কি রাষ্ট্রীয় খরচে প্রাথমিক শিক্ষার পক্ষে ছিলেন?



৭. অসমাপ্ত আত্মজীবনী শেখ মুজিবুর রহমান, ইউপিএল, পৃষ্ঠা: ৬৩।

৮. জীবন সংগ্রাম; মণি সিংহ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, পৃষ্ঠা: ৮৪-৮৫।

রাষ্ট্রকে নাগরিকদের প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব নিতে বলেন বাংলাদেশের মূল ধারার বামপন্থীরা। বাম ছাত্র সংগঠন গুলোর প্রথম এবং প্রধান দাবী এটাই। তারা মনে করেন এইটা একটা প্রগতিশীল কর্তব্য।

অথচ জেনে আশ্চর্য হবেন কার্ল মার্ক্স এর ঘোরতর বিরোধি ছিলেন। তিনি এই ব্যবস্থাকেই কৃতিক অব গোথা প্রোগ্রামে বলেছিলেন “অলটুগেদার অবজেকশনেবল”।

কার্ল মার্ক্স এই কথাটা এমনি এমনি বলেন নাই। শিক্ষা মতাদর্শ শেখানোর জায়গা। এখানে শুধু স্কিল নয় ইডিওলজিও শেখানো হয়। রাষ্ট্র ক্ষমতায় যদি ফ্যাসিস্ট থাকে সে চাইবে এই শিশুদের ফ্যাসিস্ট মতাদর্শে শিক্ষিত করতে। তাই রাষ্ট্রের হাতে নয় সমাজ বা কওমের হাতে এই দায়িত্ব থাকুক এটাই চাইতেন মার্ক্স।

তাহলে মূলধারার বামপন্থীরা নিজেদের মার্ক্সবাদী দাবী করেও মার্ক্স এর এই চিন্তার সাথে কন্ট্রাডিক্ট করছে কেন? তার কারণ এরা মার্ক্স পড়েনি। এদের মধ্যে মার্ক্স পাঠের ঐতিহ্য নাই। এরা মার্ক্সবাদী নয় এরা আসলে মডার্নিস্ট। মডার্নিজম হচ্ছে পুজিবাদের ভাবাদর্শ। এরা মার্ক্স এর নাম নিয়ে মার্ক্স এর বিরুদ্ধেই কামান দাগে।

যারা মার্ক্স পাঠ করেছে আর এই বিষয়গুলো বুঝে তর্ক তোলার ক্ষমতা রাখে, বাংলাদেশের মূলধারার বামপন্থীরা তাদের বাম মহলে ব্রাত্য করে রাখে। তাদেরকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে চিনিয়া দেয়।

কী তামাশা!!

বাংলা ও মুসলমান

বাংলা সাহিত্যে মুসলমানরা ।

বরেণ্য ভাষাতত্ত্ববিদ শ্রী সুকুমার সেনের একটা বই আছে, নাম—‘ইসলামি বাংলা সাহিত্য’। বইটা প্রকাশ হওয়ার পর তার নামে বিশাল সমালোচনা শুরু হয়। সমালোচনার মূল বক্তব্য ছিল—সাহিত্য কীভাবে ‘ইসলামি’ হয়? সুকুমার সেন বলেছিলেন, ‘যাদের রচনা আমার বইটিতে আলোচিত হয়েছে, তাদেরই কেউ কেউ ‘এছলামি বাংলা’ নামটি ব্যবহার করেছিলেন। আমি ‘এছলামি’ শব্দটিকে স্বাভাবিকভাবেই ‘ইসলামি’ করে নিয়েছি। তাতে এমন কী দোষ হয়েছিল তা এখনো বুঝতে পারছি না।’

আসলে দোষ হয়েছিল অন্য জায়গায়। তিনি দেখিয়েছিলেন, বাংলা রোমান্টিক কাহিনী-কাব্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত মুসলমান কবিদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল।

১৮৩৯ সালে বাংলা শাসনকাজে ফারসির পরিবর্তে বাংলা চালু হয়। তখন বাংলা ভাষার একটা সংস্কার হয় সংস্কৃত শিক্ষিত বাঙালিদের হাতে। তারা পরিকল্পিতভাবে আরবি ও ফারসি শব্দের আমদানি বন্ধ করে। শুধু তাই নয়, স্বল্পপরিচিত আরবি ও ফারসি ভাষা বাংলা থেকে বিতাড়িত করে। বাংলায় ফারসির ব্যবহার এতো সহজাত ছিল যে, হিন্দু ধর্মের রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কথার ওপর ভিত্তি করে রচিত বাংলা ভাষায় চর্যাপদের পর আদি-মধ্য বাংলা ভাষার প্রাচীনতম আবিষ্কৃত নিদর্শন কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ফারসি শব্দ আছে।

বাংলার সংস্কৃতায়নের সংস্কারই বাংলা ভাষার মূলধারা হয়ে ওঠায় মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের রচনা ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝ থেকেই মূলধারা থেকে গৌণধারায় পরিণত হয়।

ভাষার রাজনীতি শুধু আবেগ দিয়ে মোকাবেলা করলেই হয় না; সাথে প্রজ্ঞা, কৌশল আর দূরদৃষ্টিও লাগে।

বাঙলায় ইসলামের প্রসারের কারণ

‘বঙ্গীয় মুসলিম কাঁহারার, বাঙলার ধর্মাস্তর এবং ইসলামিকরণ সম্পর্কে কিছু কথা’ শিরোনামে রিচার্ড এম ইন-এর প্রবন্ধ কেন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল? কারণ, তিনি বাঙলার এই অঞ্চলের সম্প্রদায়গত দ্বন্দের উর্ধ্বে উঠে নির্মোহ দৃষ্টিতে ইতিহাস বিচার করেছিলেন।

সম্প্রতি রিচার্ড এম ইটনের প্রবন্ধের সূত্র ধরে লেখা স্ট্যাটাসে যে প্রশ্নগুলো এসেছিল, সেগুলোর উত্তর দেয়ার চেষ্টা করছি।

১. বাঙলার পূর্বাঞ্চলে ১৭ শতকের আগে জনসংখ্যা পশ্চিমাঞ্চলের তুলনায় অনেক কম ছিল। অধিকাংশ এলাকায় ছিল দুর্গম গহীন শালের জঙ্গল।
২. ১২০৪ সালে তুর্কি বিজয়ের আগে বাঙলার পশ্চিমাঞ্চলে ভারতীয় আর্য সভ্যতার শিকড় ছিল গভীর, বর্ণাশ্রম প্রথা ছিল, বর্ধমানবাসী কবি মুকুন্দরাম বর্ণভেদক্লিষ্ট সমাজের বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গে এই বর্ণভেদ প্রথার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। পূর্ববঙ্গ ছিল হিন্দু সংস্কৃতির মূলকেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন। নদীর উপত্যকা ধরে কিছু বসতি থাকলেও বিশাল অঞ্চলের অধিবাসী ছিল অনগ্রসর এবং তাঁদের হিন্দু ধর্ম বা সংস্কৃতি খুব অল্পই স্পর্শ করেছিল। রিচার্ড ইটন সাক্ষ্য দিয়েছেন, পূর্ববঙ্গের হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা পূর্ণ হিন্দু হয়ে উঠতে পারেনি।
৩. পূর্ব বাঙলায় নতুন ফসলি জমি তৈরি হওয়ায় সম্রাট আকবরের সময় থেকে জঙ্গল কেটে আবাদি জমি তৈরি করার কাজে অসংখ্য পরিশ্রমী মানুষ নিয়োজিত হয়। সেই মানুষের জমিতে কোনো কর ছিল না। এই নিষ্কর জমিতে তাঁদের ধর্ম বিশ্বাস অনুসারে একটি মন্দির অথবা মসজিদ স্থাপন বাধ্যতামূলক ছিল। এই জমিগুলোই দেবোত্তর সম্পত্তি বলে আমরা জানি। মোঘল আমলের নথি অনুসারে জঙ্গল কাটা মানুষের স্থাপিত মন্দিরের চেয়ে মসজিদ অনেক বেশি ছিল। কারণ, মূলত মুসলমানরাই এই জঙ্গল কাটার নেতৃত্ব দিত।
৪. জঙ্গল কাটার নেতারা অধিকাংশ এসেছিলেন উত্তর ভারত থেকে। এবং তাঁদের অনুসারীরা সেই নেতার ওপর তাঁদের মৃত্যুর পরে দেবত্ব আরোপ করে। তাঁদেরকে পীর হিসেবে মেনে নেয়। গড়ে ওঠে দেবোত্তর সম্পত্তির পাশে সেই নেতার মাজার। কৌতূহলোদ্দীপক হচ্ছে, ইসলামে মাজার নিষিদ্ধ হলেও বাঙলার মুসলিম নেতারা মাজারেই এখনো নন্দিত হন। লোকায়ত ধর্মের সাথে ইসলামের এক ধরনের ফিউশন হয়।
৫. সেই সময়ের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এই জঙ্গল কাটার উপাখ্যান আছে—

“পশ্চিম থেকে এল জাফর মিয়া
তার সঙ্গে বাইশ হাজার লোক
তাঁদের হাতে সুলেমানের দেওয়া পুঁতি
তাঁরা গাইছিল পীরের নাম এবং ঈশ্বরের নাম
জঙ্গল পরিষ্কার করে শয়ে শয়ে বিদেশি
এল এবং প্রবেশ করলো জঙ্গলে
কুঠারের শব্দ শুনে
ভয় পেলো বাঘ, এবং ছুটে পালালো ব্রাহ্ম নিনাদে”

৬. পূর্ব বাঙলায় তলোয়ার দিয়ে ইসলাম কায়েম হয়নি। ইসলাম কায়েমের নেতা ছিল পরিশ্রমী কিছু মানুষ, যারা পূর্ববঙ্গে লোকায়ত ইসলাম এবং কৃষির প্রবর্তন একইসঙ্গে করেছেন। কিছু জোর-জবরদস্তি নিশ্চয় হয়েছে। কিন্তু সেটাই পূর্ববঙ্গে ইসলাম প্রসারের নির্ধারক কারণ নয়। এই সত্যটা রিচার্ড ইটন প্রমাণ করে দিয়েছেন। এই সত্য গ্রহণ করলে হিন্দুদের পরাজয়ের গ্লানিতে ভোগার প্রয়োজন হবে না। মুসলমানদের আত্মগর্বি হয়ে অপর সম্প্রদায়কে তাচ্ছিল্য করতে হবে না। এই উপলব্ধি বাংলাদেশে খুব দরকার। বাঙালি জাতির দুই ধর্ম সম্প্রদায়কে কাছাকাছি আনার জন্য ইতিহাসের ধুলি-বালি সরিয়ে সত্যের উন্মোচন জরুরি।

বঙ্গে ইসলামি বিজয় কেন ভায়োলেন্ট হয়নি

ইসলাম বিজয়ের যুগে সেমেটিক ইসলামকে কনফ্রন্ট করেছে স্থানীয় সংস্কৃতিগুলো। বেঙ্গলও করেছে; কিন্তু সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক হলো, বেঙ্গলে এই কনফ্রন্টেশনটা ভায়োলেন্ট হয়নি বরং হয়েছে সমাজসংস্কার আর প্রথম মানবতাবাদী ধারার উদ্ভব। কনফ্রন্টেশনটা হয়েছে প্রেম ও ভক্তিবাদে। কেউ কেউ এটাকে বলেন, বেঙ্গলের প্রথম রেনেসাঁ। ইসলামের আগমনে জন্ম নেয়া একদিকে শ্রীচৈতন্যের হিন্দু ভক্তিবাদ, অন্যদিকে মুসলিম মরমী সুফী-সাধকদের আধ্যাত্মিক মানবতাবাদ বাংলার গোটা সমাজ জীবনকে উজ্জীবিত করে তুলেছিল। হিন্দু ধর্মের মানবিক সংস্কার হয়েছিল। গোড়াপত্তন হয়েছিল এক নতুন সমন্বয়ধর্মী সংস্কৃতির। বাংলা সাহিত্যের জন্য এসেছিল সেসময় স্বর্ণ যুগ। বস্তুত এই সময়কাল থেকেই বাঙালির জীবনে এই উদার সমন্বয়ধর্মী মানবতাবাদী ধারা প্রবাহিত হতে শুরু করেছিল যার পরিচয় পাওয়া যায় সে কালের হিন্দু মুসলমান কবিদের রচনায়। ‘শুনো মানুষ ভাই সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই’ পনের শতকের বৈষ্ণব কবি চণ্ডিদাসের এই অমর বাণীতে পৃথিবী প্রথম শোনে মানবতাবাদের জয়গান। ঠিক একইভাবে সতের শতকের মুসলিম কবি আবদুল হাকিম রচিত ‘নূরনামা’য় এক উদার সমন্বয়ধর্মী মতাদর্শের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। আব্দুল হাকিম নূরনামায় লিখেছিলেন-‘য়াল্লা (আল্লাহ) খোদা-গোঁসাই সকল তান (তাঁর) নাম সর্বগুণে নিরঞ্জন প্রভু গুণধাম।’ এই ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়া জরুরি। বাঙলায় ইসলামের আবির্ভাব আর সমাজে সেই ধর্মের অভিঘাতের সেই ইতিহাস ভুলে আমরা কেউ কেউ অন্যের তৈরি করা বয়ানে বাঙলার ইসলামকে মূল্যায়ন করছি। বিনির্মিত সেই ভুল ইতিহাস আমাদের নয়।

বাংলা ভাষা ও মুসলমানদের অবদান।

বাঙলার মুসলিম বিজয় বাংলা ভাষাকে উচ্চতর সাহিত্যের আসনে উন্নিত করতে মূল ভূমিকা রেখেছে।
দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর ‘History of Bengali Language and Literature’-এ লিখেছেন—

‘This elevation of Bengali to a literary status was brought about by several influences, of which the Mahammadan conquest was undoubtedly one of the foremost. If the Hindu Kings had continued to enjoy independence, Bengali would scarcely have got an opportunity to find its way to the courts of Kings.’

‘যে কয়েকটি প্রভাবের কারণে বাংলা ভাষা উচ্চতর সাহিত্যের স্তরে উন্নিত হয়েছে, তার মধ্যে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো মুসলিম বিজয়। যদি হিন্দু রাজারা স্বাধীনভাবে তাদের রাজত্ব চালাতে পারতো, তবে বাংলা রাজদরবারে মোটেই প্রবেশের সুযোগ পেত না।’

দীনেশ চন্দ্র সেন আরো বলছেন, ‘মুসলমানরা এইভাবে বাঙ্গালা ভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া আমাদের সাহিত্যে এক নূতন যুগ আনয়ন করিলেন। মুসলমান আগমনের পূর্বে বঙ্গভাষা কোনো কৃষক রমণীর মতো দীনহীন বেশে পল্লী কুটিরে বাস করিতেছিল।’ (দীনেশ চন্দ্র সেন, ‘প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান’)

প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন—

‘Bengali literature was born in Mahommeden Age.’ অর্থাৎ, ‘বাংলা সাহিত্যের জন্ম মুসলিম যুগে।’ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও উল্লেখ করছেন,

‘আমাদের বাংলা বিভক্তি ‘রা’ ও ‘দের’ মুসলমানদের কাছ হইতে লওয়া। তাছাড়া, আমরা কী করে ভুলে যাই চতুর্দশ শতাব্দীর মুসলমান সুলতান এবং রাজপুরুষদের কথা, যাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যে এক গৌরবময় অধ্যায় রচিত হয়?’

ভিনদেশী শাসকেরা বাঙলাকে ভালবেসে বুকে তুলে নেয়াতে বাঙলার মর্যাদা বাড়ল। স্থানীয় শাসকেরা এবং বাঙলার হিন্দু রাজারাও রাজদরবারে বাংলা ব্যবহার শুরু করলেন।

আজকে যে বাংলা ভাষায় কথা বলি, তার উদ্ভব বা সৃষ্টিই হয়েছিল মুসলমানদের অবদানে, এটা আজকে সকালে আমার স্ট্যাটাसे কमेंट করায় অনেকে চটেছেন। আসুন বাংলা ভাষার উৎস নিয়ে কিছু আলাপ করি।

সবচেয়ে প্রাচীনতম যে বাংলা ভাষার নিদর্শন তা চর্যাপদ। চর্যাপদ ছিল শৌরসেনী প্রভাবিত অতি আদিম বাংলা, যখন বাংলা ভাষার গঠন সুস্থির ছিল না। এখনো চর্যাপদের ভাষা বাংলা কিনা তা নিয়ে একাডেমিশিয়ানরা তর্ক করেন। এ বিষয়ে স্বয়ং সুনীতিকুমার বলেছেন, চর্যাপদের ভাষা বাংলাই, তবু সংশয় কোনো কোনো মহলে থেকেই গেল। চর্যার শেষ পদাবলীগুলো রচিত হয়েছিল ১২০০ সাল পর্যন্ত।

সুস্থিত আদি বাংলায় প্রথম রচনা বড় চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যা রচিত হয়েছিল চতুর্দশ থেকে পঞ্চদশ শতকে, মুসলমান শাসন তখন মধ্যগগনে।

বাংলা ভাষা মুসলমানের সৃষ্টি এটা আমার কথা নয়; দীনেশচন্দ্র সেনের কথা। তিনি কী লিখেছিলেন সেটা দেখুন—

“মুসলমান আগমনের পূর্বে বঙ্গভাষা কোনো কৃষক রমণীর ন্যায় দীনহীন বেশে পল্লী কুঠিরে বাস করিতেছিল। বাঙ্গালা ভাষা মুসলমান প্রভাবের পূর্বে অতীব অনাদর ও উপেক্ষায় বঙ্গীয় চাষার গানে কথঞ্চিৎ আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। পণ্ডিতেরা নস্যাদার থেকে নস্য গ্রহণ করে শিখা দোলাইয়া সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি করতে ছিলেন এবং ‘তৈলাধার পাত্র’ কিংবা ‘পত্রাধার তৈল’ এই লইয়া ঘোর বিচারের প্রবৃত্ত ছিলেন। সেখানে বঙ্গভাষার স্থান কোথায়? ইতরের ভাষা বলিয়া বঙ্গভাষাকে পণ্ডিতমণ্ডলী দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেন, হাড়ি-ডোমের স্পর্শ হইতে ব্রাহ্মণেরা যেরূপ দূরে থাকেন বঙ্গভাষা তেমনই সুধী সমাজের কাছে অপাণ্ডিত্যেয় ছিল তেমনি ঘৃণা, অনাদর ও উপেক্ষার পাত্র ছিল। কিন্তু হীরা-কয়লার খনির মধ্যে থাকিয়া যেমন জহুরীর অপেক্ষা করিয়া থাকে, বঙ্গভাষা তেমনই কোনো শুভদিন, শুভক্ষণের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। মুসলমান বিজয় বাঙ্গালা ভাষার সেই শুভদিন, শুভক্ষণের সুযোগ আনয়ন করিল। বঙ্গ-সাহিত্যকে একরূপ মুসলমানের সৃষ্টি বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।”

পর্দা প্রথা ও নারী।

আমি বেশ কিছুদিন আগে লিখেছিলাম, পর্দা প্রথা একচেটিয়া আরবের সংস্কৃতি নয়। ভারতবর্ষে সুদূর অতীত থেকেই পর্দা প্রথা ছিল। এই পর্দা প্রথাকে অনেকে পুরুষতান্ত্রিক জুলুম বলে প্রতিষ্ঠা করতে চান। আমার মনে হয়, এই সরলীকৃত পশ্চিমা উপসংহারকে প্রশ্ন করা যায়।

আমাদের ভূখণ্ডে নারীরা প্রচণ্ড স্বাধীনচেতা এবং তাদের ওপরে কোনো কিছুই চাপিয়ে দেয়া সম্ভব নয়; যদি না তারা নিজেরাই সেটা গ্রহণ করে। তারা নিজেদের মতো প্রতিরোধ আর প্রতিবাদের ভাষা তৈরি করে। যদি আপনি সেই ভাষা পড়তে পারেন, তাহলে সেই প্রতিরোধের গল্প আপনাকে চমৎকৃত করবে। আপনি নারী সমস্যাকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে চাইবেন।

আমি আপনাদের ইতিহাস থেকে নারীদের প্রতিরোধের তিনটে উদাহরণ দেবো। পশ্চিমা সংস্কৃতি আমাদের পুরুষদের পোশাক পর্যন্ত বদলে দিয়েছে। আমরা বেশিরভাগ পুরুষরা আনন্দচিহ্নে কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই পশ্চিমা পোশাক গ্রহণ করেছি। নারীরা তাদের শাড়ি কিন্তু ছাড়েনি। কওমি মাদরাসাও তাদের পোশাক ছাড়েনি।

আমরা পশ্চিমের শিক্ষা নিয়েছি পুরোটা। ভ্যালুজ নেয়ার চেষ্টা করেছি, চিন্তা কাঠামো নিয়েছি। সবকিছুই আনক্ৰিটিক্যালি গ্রহণ করেছি। রান্নাঘর যেহেতু নারীরা সামলায়, তাই আমরা পশ্চিমা ফুড বা খাদ্যাভ্যাস গ্রহণ করিনি।

হিন্দুধর্ম পালনে নারীদের নানা বাধা থাকার কারণে, বাংলার নারীরা পরিবার আর সমাজের মঙ্গল কামনায় ব্রত পালনের ঐতিহ্য গড়ে তোলে। শত শত ব্রত পালনই এখন বাংলায় হিন্দু ধর্মের মূল আচার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ব্রত পালন অনেকটা শুদ্ধাচার বা রোজা রাখার মতো। সারাদিন উপবাস থেকে শুদ্ধ চিন্তা করে, ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে বাংলার নারীরা এই ব্রত পালন করে। ব্রত পালন করতে গিয়ে সে এক নতুন ধরনের ধর্মচর্চার জন্ম দেয়।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমার ওয়ালে আমার অফিসে স্যুটিং হওয়া একটি হিজাবের বিজ্ঞাপন নিয়ে ওঠা আলাপের সূত্র ধরে কিছু কথা বলা। এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, আমি আগ্রহভরে বিজ্ঞাপন নির্মাতাকে ডেকে এনে এই বিজ্ঞাপনচিত্রের স্যুটিং করিয়েছি। আমি জানতাম না কিসের স্যুটিং হয়েছে। আমার অফিসে এর আগে বিশিষ্ট সেক্যুলার নির্মাতা আবু সাজ্জিদ ভাইও একটা নাটকের স্যুটিং করেছেন। আমাদের কাজের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে অন্য কেউ যদি স্যুটিং করতে চান, আমি অনুমতি দেবো। কোনো অসুবিধা নেই।

সেই হিজাবের বিজ্ঞাপনে একটা ট্যাগ লাইন ছিল, ‘হিজাব আমার আত্মবিশ্বাস’। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে হিজাব কীভাবে আত্মবিশ্বাস হতে পারে।

আমরা লিবারেল দুনিয়ার মূল্যবোধে পোশাক নিয়ে আলোচনা করি। পোশাক কি ব্যক্তির ইচ্ছায় পরিধেয়, নাকি সমাজের ইচ্ছায় নির্ণীত? এটা মনে হতে পারে, পোশাকে ব্যক্তির ইচ্ছাই সর্বোচ্চ। এটা ভুল ধারণা। পোশাক আপনার হতে পারে কিন্তু এটা আপনি নিজে দেখেন না, দেখে অন্যরা। শুধু আপনি ছাড়া আর সবাই সেই পোশাকে আপনাকে দেখে। অন্যরা আপনার পোশাক দেখতে বাধ্য হন। আপনার পোশাক অন্যের চোখকে পীড়া দিতে পারবে না। তাই আপনি যা খুশি তাই পরতে পারেন না। অন্যকে সেটা দেখতে হয়। ‘আমার যা ইচ্ছা তাই পরবো’ এটা একটা ভ্রান্ত ও সমাজবিরোধী আকাঙ্ক্ষা।

তাহলে প্রশ্ন আসতেই পারে। পোশাক নির্বাচনে ব্যক্তির কি কোনো ভূমিকা নেই? অবশ্যই আছে। এটাই ব্যক্তির সাথে সমাজের নেগোশিয়েশন। সামাজিক সম্মতি উৎপাদন করা। যেটাকে ট্রেন্ড বলা হয়। সেটাই ট্রেন্ড হয়ে ওঠে, যার পেছনে সামাজিক সম্মতি আছে।

আমার বয়সী যারা আছেন, তারা হয়তো মনে করতে পারবেন, একসময় বাংলাদেশে কাবুলি ড্রেসের ফ্যাশন শুরু হয়েছিল। প্রবল সামাজিক বাধায় সেই ফ্যাশন চলতে পারেনি।

যেই পোশাকে সামাজিক সম্মতি থাকে, সেই পোশাক পরলে তো ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস বাড়বেই। গণমানুষের ইচ্ছার পক্ষে দাঁড়িয়ে যে রাজনীতি করে, ঠিক একইভাবে সে দুর্দান্ত সাহসী হয়।